৭.০৯ রূপালী সূর্য – Bangla Library

৭.০৯ রূপালী সূর্য – Bangla Library

রূপালী সূর্য– ১০৯

দিপালী একগাদা ফুল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখেমুখে বিস্ময়, বনহুরকে সে এখানে দেখছে, এ যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

কিছু বলতে যাচ্ছিল দিপালী, বনহুর চোখের ইশারায় তাকে চুপ থাকতে বললো এবং পরে সব বলবে তাও ইংগিতে জানিয়ে দিলো।

দিপালীর সন্ধান করে ফিরছিলো বনহুর। এত সহজে সে দিপালীকে পেয়ে যাবে, এ যেন তার কাছে এক মহাবিস্ময়, কারণ এটা পৃথিবীর বুকের ব্যাপার নয়। পৃথিবীর বুকেও কেউ বুঝি এত সহজে তার হারানো জনকে খুঁজে পায় না।

রাজদরবারে উৎসব শেষ হলো।

ওরা বনহুরকে অতি সমাদরে নিয়ে চললো। বনহুরের চারপাশে ঘিরে ওরা এগিয়ে চলেছে।

সবাই আনন্দধ্বনি করছে।

মহিলাটি নিজ বাসস্থানে আশ্রয় দিলো বনহুরকে। আদর যত্নের সীমা নেই বনহুরের।

পৃথিবীর মানুষের চেয়ে আদর–আপ্যায়ন এরা কম জানে না। এদের মধ্যেও আছে সীমাহীন আন্তরিকতা।

হিংস্র জলজীবটাকে হত্যা করে আজ সে মঙ্গল গ্রহের জনগণকে খুশি করতে পেরেছে, করেছে আকর্ষিত।

অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে মহিলাটি এবং তার সঙ্গী পুরুষটি।

বনহুর কয়েক দিনেই বুঝে নিয়েছিলো মহিলাটি ঐ এলাকার সর্দার এবং পুরুষটি তার স্বামী।

তরুণীদের মধ্যে যে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো সে সর্দারের মেয়ে। তার নামও বনহুর জেনে নিলো–নাম ওর মৌ।

রাজকন্যা রী মৌ-এর বান্ধবী।

এক অক্ষরে নাম বেশ লাগলো বনহুরের। কিছু কিছু কথা–বার্তাও শিখে নিলো বনহুর কদিনের মধ্যেই। সেখানে রাত বা দিনের বালাই নেই। মানুষ সব সময় কাজ করে যাচ্ছে। যার যা কাজ যেন রুটিন করা আছে। যখন তারা ক্লান্তি বোধ করে তখন বিশ্রাম নেয় বা ঘুমায়।

অদ্ভুত এ দেশ।

বনহুর রাজপ্রাসাদে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলো। কারণ সেখানে দিপালী আছে। দিপালীকে নিয়ে সে ফিরে যাবে পৃথিবীর বুকে।

দিপালী জীবিত আছে, ভাল আছে।

পূর্বের চেয়ে সে আরও সুন্দর হয়েছে। তবে পূর্বের সে উচ্ছলতা নেই, দীর্ঘ সময় তাকে এই মঙ্গল গ্রহে কাটাতে হয়েছে।

মঙ্গল গ্রহে এত সুখে বসবাস করেও দিপালীর মুখে হাসি ছিলো না, একটা ক্ষুব্ধ ব্যথা জর্জরিত করে তুলছিলো। বহু খুঁজেছিলো দিপালী বনহুরকে, কিন্তু তাকে কোথাও সে আর খুঁজে পায়নি।

অব্যক্ত একটা যন্ত্রণা তাকে দগ্ধীভূত করছিলো। একটা অবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছিলো দিপালীর মনে। সত্যিই বনহুর তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে! একা এই নিঃসঙ্গ স্থানে তাকে বনবাস দিয়ে গেছে। আর কোনোদিন সে ফিরে যেতে পারবে না পৃথিবীর বুকে। এমনিভাবে গভীর ব্যথা বুকে চেপে দিপালী নিজেকে জীবিত রেখেছিলো পৃথিবী ছেড়ে কোটি কোটি মাইল দূরে মঙ্গল গ্রহে।

অনেক সাধনার পর দিপালী ফিরে পেয়েছে বনহুরকে–তার রাজকুমারকে। কি যে আনন্দ লাগছে, এ আনন্দ যেন সীমাহীন। নিশ্চয়ই আর সে তাকে ছেড়ে যাবে না। যেখানেই থাক একবার না একবার ফিরে আসবেই তার রাজকুমার তার পাশে।

*

বনহুর এক সময় সবার দৃষ্টি এড়িয়ে রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি একটা উদ্যানে এসে দাঁড়ালো। এখান থেকে চারদিকে দৃষ্টি যায়।

দেখলো বনহুর, বাগানে কয়েকটি মেয়ে বিচরণ করে ফিরছে। শুভ্র পোশাকে আচ্ছাদিত তাদের শরীর। রেশমের মত সোনালী চুলে রূপালী সূর্যের আলো ঝকঝক করছে।

এক একটি তরুণীকে পরী বলে ভ্রম হয়। শুধু ডানা নেই তাদের কিন্তু এত সুন্দর রূপ বুঝি পৃথিবীর মানুষের হয় না।

দূর থেকে বনহুর অবাক হয়ে দেখছিলো। যেমন সুন্দর ফুলের দিকে মানুষ তাকিয়ে থাকে অপলক চোখে তেমনিভাবে।

বনহুরের চোখ দুটো দিপালীকে খুঁজতে শুরু করলো এবার।

কিন্তু এদের মধ্যে দিপালী নেই।

এক সময় ব্যর্থ মনোভাব নিয়ে ফিরে এলো বনহুর তার আবাসস্থানে। ভালই লাগছে বনহুরের এখানে। ফলমূল তার খাদ্য, সুন্দর মিষ্টি পানি সে পান করে। হাল্কা শরীর নিয়ে চলাফেরা করে। পুরুষ সাথী তেমন কেউ নেই মহিলার স্বামী ছাড়া।

তরুণীরা বনহুরকে প্রায় সব সময় ঘিরে রাখে। যখন এরা বাইরে জমিতে কাজ করতে যায় তখন ওরা বনহুরকে রেখে যায় তাদের বাড়িতে। অবশ্য কোনো কোন সময় সঙ্গে নিতেও ছাড়ে না।

মন্দ লাগে না বনহুরের।

কিন্তু মন তার সর্বক্ষণ দিপালীর সন্ধান করে ফিরছে। ওকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে তার সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যাবে।

বনহুর মঙ্গল গ্রহের ভাবধারা ভালভাবে উপলব্ধি করে। মাঝে মাঝে মনে হয় সে স্বপ্ন দেখছে। যা সে দেখছে তা মোটেই বাস্তব বলে মেনে নিতে মন তার চায়না কিন্তু আসলে বাস্তব সব কিছু। বনহুর লক্ষ্য করেছে এখানে কোনো দোকান বা বিক্রয়কেন্দ্র নেই। এদেশে কোনো সিনেমা হল বা ঐ ধরনের বিনোদনমূলক কিছু নেই। এখানে গোটা রাজ্যটাই যেন আনন্দভূমি। পঙ্কজমিতে প্রচুর ফুল ফল এবং ঐ ধরনের ফসল ফলছে। যার যা প্রয়োজন ঝুড়িভর্তি উঠিয়ে নিয়ে আসছে। প্রয়োজনের বেশি কেউ একটাও ফুল বা ফল নেবে না।

জমিতে সবাই চাষ করছে এবং গাছপালা লাগাচ্ছে। কোনটা কার জমি তারও কোনো হদিস নেই। জমিতে চাষ করার জন্য বা ফসল লাগানোর ব্যাপারে কাউকে ডাকতে হয় না। নিজ নিজ কর্তব্য মনে করে সবাই এখানে কাজ করে চলেছে।

এক ধরনের চাষ হয়, যে চাষে লতাগুলু থেকে তুলো জাতীয় বস্তু হয় এবং তা থেকে সুন্দর সুন্দর কাপড় তৈরি হয়। মিল কারখানা তেমন নেই, এদেশের মানুষ হাতেই নানা ধরনের জিনিস তৈরি করে থাকে। কতকটা আমাদের পৃথিবীর মানুষের কুটির শিল্প জাতের মত।

পথে মূল্যবান পাথরের ছড়াছড়ি।

এদেশে মূল্যবান পাথরের সামগ্রী কেউ বাক্সে বন্ধ করে রাখে না। অর্থ বা টাকা–পয়সার কোনো দরকার কেউ মনে করে না। চোর–ডাকাত বা ঐ ধরনের লোক আছে কিনা এখনও বনহুর তার হাদিস পায়নি।

রাজা-রাণী ও সর্দারকে এরা যথেষ্ট সম্মান করে। মহিলা বেশি, পুরুষ কম। ছোট শিশুর সংখ্যা নেই বললেই চলে।

এদের মধ্যে বৃদ্ধা এবং বৃদ্ধ অত্যন্ত কম।

দীর্ঘদিন এরা জীবিত থাকে।

এরা সবাই কাজ করে, পোশাক নিজের হাতে তৈরি করে, মণিমুক্তাখচিত পোশাক পরতে এরা ভালবাসে। এমন কি এরা নিজ নিজ বাসস্থানগুলোকেও মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরি করেছে।

রূপালী সূর্যের আলোতে বাড়িগুলো স্বপ্নপুরী বলে মনে হয়।

মঙ্গল গ্রহের মানুষগুলো অদ্ভুত সুন্দর এবং কোমলমনা। তবে কিছু কিছু মানুষকে বনহুর বেশ কঠিন হতেও দেখেছে। যেমন মৌ জননী নারী হলেও সে পুরুষের চেয়েও কঠিন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর আপন মনে বসে বসে ভাবছিলো।

হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বর–রাজকুমার।

কে দিপালী!

হা।

আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।

আমার পরম সৌভাগ্য...

দিপালী, আমি ভেবে পাচ্ছি না কেমন করে এটা সম্ভব হলো। তোমাকে ফিরে পাওয়া তো দূরের কথা, মঙ্গল গ্রহে আবার আমি আসবো এটা বড় আশ্চর্যজনক। একটু থেমে বললো, বনহুর–সে বিস্ময়কর কাহিনী শুনলে তুমিও অবাক হবে। আচ্ছা বলো তো হঠাৎ কি করে এখানে হাজির হলে?

সবই আমার ভাগ্য। বললো দিপালী।

বনহুর বললো–সুযোগ এলেই আমরা মঙ্গল গ্রহ ত্যাগ করবো তুমি প্রস্তুত থেকো দিপালী।

রাজকুমার, আমি সর্বক্ষণ প্রস্তুত আছি। যখনই সময় আসবে স্মরণ করবেন।

স্মরণ করলেই তোমাকে পাবো?

নিশ্চয়ই পাবেন, কারণ, আমি আপনার আশেপাশেই থাকবো। রাজকুমার, একটা কথা বলবো?

বলো?

দীর্ঘ সময় মঙ্গল গ্রহে অবস্থান করে আমি এখানকার অনেক কিছুই অনুধাবন করতে পারছি। এমন কি এদের কথাবার্তাও আমি বুঝতে পারি।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই, আমি এ কদিনেই অনেক কথা শিখতে পেরেছি।

সত্যি রাজকুমার?

হাঁ দিপালী।

জানেন মঙ্গল গ্রহের রাজকন্যা রী তার বান্ধবী মৌ–কে বলছিলো তার নাকি আপনাকে খুব পছন্দ। সে মনপ্রাণ দিয়ে আপনাকে ভালবেসে ফেলেছে।

একটু হেসে বললো বনহুর–দিপালী, ভেবেছিলাম মঙ্গল গ্রহের মানুষগুলোর মন পৃথিবীর মানুষদের চেয়ে আলাদা হবে কিন্তু।

–বলুন রাজকুমার, থামলেন কেন?

এখানেও প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা-ভাললাগা। সত্যি দিপালী বড় খারাপ লাগে যখন এ কথাগুলো আমার কানে আসে।

রাজকুমার, আপনি কি বলতে চান এদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ভালবাসা থাকবে না?

ঠিক তা বলছি না, বলছি মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তাই হয়তো পৃথিবীর মানুষের মতই এদেরও মন-প্রাণ-হৃদয় আছে আর সে কারণেই মঙ্গল গ্রহের রাজকুমারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি কিন্তু—

বলুন?

কিন্তু শুধু রী নয়, সর্দার-কন্যা মৌ-এর মনোভাবও ঠিক তাই।

রাজকুমার!

তার পূর্বেই সরে পড়তে চাই দিপালী।

আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

মানে অতি সহজ। রী আর মৌ-এর মধ্যে আমাকে নিয়ে একটা ঝগড়া বাঁধবার পূর্বেই

সরে পড়তে হবে, এই তো?

হ্যাঁ।

কিন্তু সে সুযোগ আসতে যদি বিলম্ব হয়?

চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি– ঐ দেখো দিপালী, মৌ তার সাথীদের নিয়ে এদিকে আসছে।

দিপালী ব্যস্তকণ্ঠে বললো–আমি তাড়াতাড়ি আড়ালে আত্মগোপন করি, না হলে ওরা আমাকে সন্দেহ করে বসতে পারে।

হ্যাঁ রাজকুমার, পরে সব বলবো। দিপালী দ্রুত সরে যায় সেখান থেকে।

মৌ দলবল নিয়ে হাজির হলো বনহুরের পাশে।

বনহুর উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখালো।

মৌ তার সঙ্গী–সাথীদের চলে যেতে বললো।

তারা চলে গেলো।

মৌ বনহুরের একখানা হাত ধরে কিছু বললো।

বনহুর সম্পূর্ণ না বুঝলেও কিছুটা বুঝলো, সে বললো–চলো ভ্রমণ করে আসি!

বনহুর হেসে ওদের ভাষায় বললো–বেশ চলো।

যেহেতু বনহুর ওদের ভাষা কিছুটা এ কদিনে শিখে নিতে সক্ষম হয়েছে তাই আমিও ওদের কথাগুলো আমাদের পৃথিবীর মানুষের ভাষায় বলবো পাঠক সমাজ যেন বুঝতে পারে।

মৌ যখন বনহুরের হাতখানা মুঠায় চেপে ধরলো তখন আশ্চর্য এক অনুভূতি অনুভব করলো বনহুর নিজের হাতে।

এত কোমল স্পর্শ বনহুর এই প্রথম অনুভব করলো। কতকটা নরম মোমের মত মনে হলো তার কাছে।

বনহুরের মুখে নিজেদের ভাষা শুনে মৌ-এর চোখ–মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তার সাধনা যেন সার্থক হয়েছে।

এই কদিন ধরে মৌ বনহুরকে তাদের ভাষা শেখানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। আজ যেন তার প্রচেষ্টা সার্থক হলো।

মৌ দুহাতে বনহুরের কণ্ঠ বেষ্ঠন করে চুমু দিলো তার ওষ্ঠদ্বয়ের উপরে, তারপর পুনঃ পুনঃ চুমু দিলো বনহুরের চিবুকে ললাটে।

বনহুর একটু বিব্রত বোধ করলো, কিন্তু সে নিজেকে সংযত রেখে বললো–চলো কোথায় যাবে বলেছিলে?

চলো বন্ধু! বললো মৌ।

মৌ ওকে টেনে নিয়ে চললো।

যতই এগুচ্ছে বনহুর মৌ-এর সঙ্গে ততই সে মুগ্ধ বিস্মিত হচ্ছে। এক জায়গায় এসে থামলো মৌ বনহুরকে নিয়ে।

সে যেন এক স্বপ্নপুরী। অপরূপ সে স্থান। মণি–মুক্তা–হীরাখচিত মঞ্চ, চারদিকে বেগুনী ফুল। আর ফুলে ফুলে ছড়ানো পথ।

বনহুর ভাবেনি এমন কোনো জায়গায় তাকে আসতে হবে।

এখানে এসে বনহুর অবাক হলো।

সেই তরুণী দল মঞ্চের উপরে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সবার দেহে ঝলমল করছে মূল্যবান শুভ্র পোশাক।

দিপালী কিন্তু আত্মগোপন করলেও একেবারে সরে যায়নি।

সে আড়ালে আড়ালে এগিয়ে যাচ্ছিলো। পথের দুপাশে ছিলো লতাগুল্মের ঝাড়। দিপালী সেই লতাগুলোর ঝাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করে দেখছিলো তার রাজকুমারকে মৌ কিভাবে নিজের আয়ত্তে টেনে নিচ্ছিলো। কিভাবে তাকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিচ্ছিলো। দিপালীর মনটা অস্থির হয়ে উঠছিলো, যদি তার রাজকুমার চিরতরে বাঁধা পড়ে যায় এই মঙ্গল গ্রহে— তাকে যদি আর পৃথিবীর বুকে ফিরে যেতে না দেয় ওরা তাহলে কি হবে! সত্যি কি রাজকুমার ভুলে যাবে পৃথিবীর কথা? তার আস্তানা, অনুচরদের কথা, তার জীবনের চেয়েও প্রিয় অশ্ব তাজের কথা? না না, তা হবে না, রাজকুমারকে সে কিছুতেই এই স্বপ্নরাজ্যে বাধা পড়তে দেবে না। এরা মায়াবিনী…

হঠাৎ চমকে উঠে দিপালী, মঞ্চের উপর একটি সিংহাসনে ওরা বনহুরকে বসিয়ে দিয়েছে। তার গলায় পরিয়ে দিয়েছে একটি অতি মূল্যবান সুন্দর মালা।

মালা থেকে আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়ছে।

মৌ তার পাশে দাঁড়িয়ে।

অন্যান্য রূপসী তরুণী সম্মুখে দাঁড়িয়ে। তারা উচ্ছল হাসিতে ফেটে পড়ছে যেন।

সবার চোখেমুখে আনন্দ উচ্ছলতা।

মৌ বললো–তোমাকে আমরা আর ছেড়ে দেবো না। আমরা তোমাকে আমাদের সাথী করে রাখবো।

মঞ্চের অদূরে কিছু লতাগুল্মের আড়ালে দিপালী দাঁড়িয়ে সব শুনতে পেলো। দিপালী ওদের ভাষা বেশ বুঝতো। সে শুনে শিউরে উঠলো। যা সে ভেবেছিলো তাই হলো। সত্যি কি তবে রাজকুমারকে হারালো সে! দিপালীর গন্ড বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো।

বনহুরের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিলো।

হীরামতি বসানো মুকুট।

অপূর্ব তার সৌন্দর্য।

মৌ সখীদের ইংগিত করলো, তারা নাচতে শুরু করলো। একদল তরুণীর হাতে ছিলো বাদ্যযন্ত্র, তারা নিজ নিজ বাদ্যযন্ত্রে ঝংকার তুললো।

সে এক মনোরম সমাবেশ।

হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে গেলো ওদিকে। দৃষ্টি বিনিময় হলো তার দিপালীর সঙ্গে। বনহুর মঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো কিন্তু মৌ তাকে পুনরায় ধরে বসিয়ে দিলো।

ওদিকে তখন মৌ-এর সঙ্গী-সাথীরা নৃত্য পরিবেশন করে চলেছে।

বনহুরের কঠিন মন কি নৃত্যের তালে আত্মহারা হয়। সে ভাবছে কিভাবে এই মায়াময় মোহজাল বিচ্ছিন্ন করে পৃথিবীর কঠিন মাটিতে পা রাখবে। কিভাবে ফিরে যাবে সে দিপালীসহ পৃথিবীর বুকে।

মাঝে মাঝে বনহুর তরুণীদের নৃত্য এবং বাদ্যযন্ত্রের মূর্ছনায় তন্ময় হয়ে যাচ্ছিলো। আবার সে নিজকে সংযত করে নিচ্ছিলো, স্মরণ হচ্ছিলো দিপালী তার মঞ্চের অদূরে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছে।

দিপালী তাকে শ্রদ্ধা করে।

দিপালীর সে শ্রদ্ধা বনহুর নষ্ট করতে চায় না।

মৌ ও তার সাথীরা বনহুরকে ঘিরে এই মহোৎসবে মেতে ওঠে। তারপর বনহুরকে নিয়ে ওরা ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়।

বাদ্যযন্ত্রগুলোর ঝংকার থেমে যায়।

ঠিক ঐ মুহূর্তে কয়েকজন জমকালো ভীষণ আকার ভয়ংকর চেহারার মানুষ হাতে বর্শা জাতীয় বস্তু নিয়ে উপস্থিত হলো সেখানে। চারপাশে তাদের ঘিরে ধরলো ওরা।

মৌ একেবারে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

তার সাথী তরুণীদের চোখেমুখে ভীতিভাব ছড়িয়ে পড়লো।

বনহুর আশ্চর্য হলো। এরা কারা, এলোই বা কোথা থেকে।

মঙ্গল গ্রহে আসার পর এমন ভয়ংকর চেহারার মানুষ তার নজরে পড়েনি। এক একটা ছোটখাটো রাক্ষস বলে মনে হচ্ছে।

বনহুর দিপালীর দিকে ফিরে তাকালো।

কিন্তু যেখানে দিপালী দাঁড়িয়ে ছিলো ঐ স্থানটি শূন্য। তাহলে কি দিপালী সরে গেছে সবার অলক্ষ্যে? হয়তো তাই হবে, না হলে সে থাকতো ওখানে।

বনহুরের ভাববার সময় নেই।

ভয়ংকর চেহারার লোকগুলো তরুণীদের ধরে ফেলছে এক এক করে, তারপর এক ধরনের রশি দিয়ে বেঁধে ফেলছে হাত দুখানাকে।

মৌ ছুটাছুটি করে কিছু বলছে।

তার চোখ দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে।

ভীষণ চেহারার লোকগুলোকে উদ্দেশ্য করে বলছে সে–তোমরা এভাবে আমাদের আক্রমণ করলে কেন?

ভীষণ চেহারার লোকগুলো কোনো জবাব দিলো না। ওদের একজন মৌকে ধরতে গেলো।

ঠিক ঐ সময় বনহুর ঐ ভয়ংকর লোকটাকে প্রচন্ড এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো, তারপর মৌকে টেনে নিলো কাছে। লোকটা পড়ে গেলো মাটিতে।

তখন অন্য লোকগুলো বনহুরকে ঘিরে ফেললো। বনহুর এবার শুরু করলো যুদ্ধ।

এক জনের হাত থেকে বর্শা কেড়ে নিয়ে বনহুর লড়াই করে চললো। সুকৌশলে বনহুর একজনের পর একজনকে ধরাশায়ী করতে লাগলো।

মৌ অদূরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য লক্ষ্য করছিলো।

মৌ-এর দুচোখে রাজ্যের বিস্ময় ঝরে পড়ছে।

মৌ-এর সঙ্গিনী যাদের হাত-দুখানাকে ওরা মজবুত করে বেঁধেছিলো তারাও কম অবাক হয়নি। সবাই তাকিয়ে আছে। এতগুলো ভয়ংকর লোকের সঙ্গে লড়াই করছে একজন দেবদূত।

সবার চোখেমুখে বিস্ময়, ভয় আর আনন্দ।

শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলো ওরা বনহুরের কাছে। পালিয়ে গেলো যে যেদিকে পারে প্রাণভয়ে।

বনহুর তাকালো মৌ-এর দিকে।

মৌ ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো বনহুরকে। তারপর আবেগভরে বললো– হে প্রিয় মোর, তোমাকে অফুরন্ত ধন্যবাদ। তুমি মানুষ নও দেবতা। নইলে এই নরপশুদের তুমি পরাজিত করতে পারো! মৌ বনহুরের কণ্ঠ বেষ্ঠন করে চুমো দিলো চোখেমুখে চিবুকে।

এবার বনহুর খুলে দিতে লাগলো মৌ-এর বান্ধবীদের হাতের বাঁধন।

সবাই মুক্তি পেয়ে বনহুরের সম্মুখে নতজানু হয়ে প্রণাম জানাতে লাগলো।

মৌ বললো–জানো এরা কারা? এরা রাজার গুপ্ত সৈন্য। এরা কোনো সময় লোকের সামনে বের হয় না। রাজা এদের ভূগর্ভে লুকিয়ে রাখে। যখন কোনো ভয়ংকর বিপদ আসে তখন সে ঐ সৈন্যদের বের করে।

বললো বনহুর-মৌ, তবে কি তোমাদের রাজা কোনো ভয়ংকর বিপদ বলে আমাকে মনে করে।

মৌ এবার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ফিরে চললো নিজ বাসস্থান অভিমুখে।

বনহুর ভাবছে এদের দেশেও তাহলে ভয়ংকর জীব, ভীষণ আকার মানুষ আছে, আছে হিংসা বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসার করাল রুপ। সে ভেবেছিলো মঙ্গল গ্রহে বুঝি সবাই সুন্দর, সবাই মনোরম কিন্তু তা নয়। আর একটি রূপ আছে যা অতি হিংস্র।

বনহুর যখন ভয়ংকর লোকগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করছিলো তখন সে অনুভব করলো তাদের দেহেও কম শক্তি নেই। এক একজন ভীষণ শক্তিবান। দেহের আকৃতির মতই নিষ্ঠুর মনও এদের।

পরনে একটিমাত্র কালো ড্রেস।

পা হতে মাথা পর্যন্ত ঢাকা।

চোখের কাছে শুধু ফুটো আছে।

ঐ ফুটো দিয়ে ওরা দেখছিলো এবং লড়াই করছিলো।

বনহুর কৌশলে ওদের পরাজিত করেছে, নইলে ওদের শক্তির কাছে তার একার শক্তি কার্যকরী হতো না। বনহুর এসব ভাবছে এবং এগুচ্ছে। পাশে পাশে চলেছে মৌ।

কিছুটা এগুতেই অদ্ভুত ড্রেসে সজ্জিত এক নারী এসে দাঁড়ালো তাদের সম্মুখে।

নারীর পেছনে সেই ভয়ংকর চেহারার লোকগুলো।

সবার হাতেই সূতীক্ষ্ণধার বর্শা।

মৌ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে সে বনহুরকে আড়াল করে দাঁড়ালো।

অদ্ভুত ড্রেসে সজ্জিত তরুণী অন্য কেউ নয়–রাজকন্যা রী। সে তাদের নিজ ভাষায় মৌ–কে লক্ষ্য করে বললো–তুমি ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে মৌ!

না, আমি ওকে কেড়ে নেইনি! বললো মৌ।

রী বললো–মিথ্যা কথা! ওকে আমি প্রথম আবিষ্কার করেছিলাম দীর্ঘ দিন পূর্বে। আমি ওকে চাই।

কিছুতেই আমি ওকে দেবো না। বললো মৌ।

রী-র দুচোখে আগুন টিকরে বের হচ্ছে! সে বললো–বান্ধবী বলে আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না মৌ। ওকে আমি বন্দী করে নিয়ে যাবো। আংগুল দিয়ে বনহুরকে রী দেখালো।

মৌ অসহায় চোখে তাকালো রাজকন্যা রী-র দিকে।

রী বললো–মৌ, যদি তুমি তোমার ও ওর মঙ্গল চাও তাহলে ওকে দিয়ে দাও।

বনহুর ওদের কথাবার্তা এখন বেশ বুঝতে পারে। সে মৌর এবং রীর কথাবার্তা অনুধাবন করছিলো। ভাবলো আবার একটা যুদ্ধ বাধবে তাকে নিয়ে। মৌ বা রী এরা দুজনই তার কাছে সমান। সে পৃথিবীর মানুষ, মঙ্গল গ্রহে সে কোনোদিন ঘর বাধতে চায় না, কারণ তার স্ত্রী–পুত্র সব আছে। আছে মা– মাকে ভুলে সে কোনো রকমেই এখানে থাকতে পারবে না।

বনহুর যখন ভাবছিলো তখন বর্শাধারী লোকগুলো তাকে ঘিরে ফেলেছে। চারপাশে সুতীক্ষ্ণার ফলা।

মৌ দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললো।

বনহুর তাকালো ওর দিকে।

ততক্ষণে দুহাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে চললো ভয়ংকর মানুষগুলো বনহুরকে।

মৌ লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

সাথীরা ওকে তুলে ধরলো, বললো–চলো মৌ, কেঁদে আর কি হবে!

মৌ কাঁদতে কাঁদতে বললো–আমাকে তোরা মেরে ফেল্ আমি ওকে ছাড়া বাঁচবো না।

সত্যি মৌ বনহুরকে ভালবেসে ফেলেছে। অবশ্য ভালবাসার কারণ রয়েছে যথেষ্ট। সেদিন মৌ ও তার সঙ্গীরা যখন নদীতীরে ভ্রমণ করছিলো তখন নদীবক্ষ থেকে একটি ভয়ংকর জীব আবির্ভূত হয়ে মৌ ও তার সঙ্গীদের আক্রমণ করেছিলো, তখন বনহুর তাদের রক্ষা করেছে জীবটাকে হত্যা করে। নাহলে জীবটা মৌকে এবং তার সাথীদেরকে হত্যা করতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ কারণে মৌ বনহুরকে জীবন দিয়ে কামনা করে এসেছে। এখন সেই প্রিয়জনকে দিয়ে দিতে হবে বান্ধবী রী-কে। না না, পারবে না সে এমন ত্যাগ স্বীকার করতে।

মৌ ছোট্ট বাচ্চার মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

ততক্ষণে বনহুরকে রী বেঁধে নিয়ে চলেছে রাজপ্রাসাদ অভিমুখে। দিপালী আড়াল থেকে সব দেখে।

মনে মনে হাসে দিপালী, হায় রে হতভাগিনী মৌ, তুমি জানোনা যাকে পাবার জন্য উন্মাদিনী হয়ে উঠেছে–তাকে কোনোদিন পাবার নয়। হায় রে রাজকুমারী রী, তুমিও জানো না ওকে বেঁধে রাখলেও বশে আনতে পারবে না। ধরে রাখতে পারবে না। বনহুরকে নিয়ে একটি কক্ষে বন্ধ করে রাখলো।

কক্ষটি সাধারণ কক্ষ নয়।

ভূগর্ভে কোনো এক কক্ষ।

দরজা পাথর বা ঐ ধরনের বস্তু দিয়ে বন্ধ।

বনহুর বন্ধ কক্ষটার মধ্যে বসে ভাবছে, সত্যিই সে আটক হলো। কবে ছাড়া পাবে তারপর ফিরে যাবে সে দিপালীসহ পৃথিবীর বুকে। আর ফিরে যেতে পারবে কিনা তাই বা কে জানে!

*

মৌ তার মাকে গিয়ে সব বললো। বনহু তাদের অতিথি– তাকে রাজসৈন্য জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গেছে। রী সৈন্য পরিচালনা করে এই কাজ করেছে। সব সে মাকে গুছিয়ে বললো।

ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত ফোঁস করে উঠলো মহিলা–সর্দার! কন্যা মৌকে আদর করে সান্ত্বনা দিয়ে বললো– যেমন করে থোক তাদের সম্মানিত অতিথিকে সে ফিরিয়ে আনবে। এক্ষুণি যাবে সে রাজ দরবারে।

রাজ দরবারে ন্যায্য বিচার হবে। রাজকন্যা বলে রেহাই পাবে না রী।

মৌ মাকে উৎসাহিত করলো, বললো–তুমি বিলম্ব করোনা মা, এখনই যাও। গিয়ে সব কথা বলল রাজাকে।

মা হীমা তার স্বামীসহ দলবল নিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে রওয়ানা দিলো।

রাজপ্রাসাদে পৌঁছতে হীমার বেশি বিলম্ব হলো না।

রীর পিতা রাজা সব শুনলেন হীমার কাছে।

যে ব্যক্তি তাদের দেশের একটি ভয়ংকর জলজীব হত্যা করে বাহাদুরী লাভ করেছে। রাজা নিজে তার গলায় পরিয়ে দিয়েছেন অতি মূল্যবান হীরার হার, যার আলোর ছটা বিচ্ছুরিত হয়ে চারদিক উদ্ভাসিত করে তোলে, সেই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে কেন?

রাজা তখনই রীকে ডেকে পাঠালেন।

রাজকন্যা রী এলো।

তার সঙ্গে এলো সখীগণ।

দিপালীও সখীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে রাজদরবারে এসে দাঁড়ালো। তার মনে ভীষণ উদ্বেগ, জানার বাসনা।

রাজকন্যা রী এসে পিতাকে সম্মান জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

রাজার পাশে বসেছে হীমা।

তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে একটা ক্রুদ্ধ ভাব।

রাজা বললেন–রী, হীমা যা বলছে তা কি সত্য? তুমি আমাদের সম্মানিত অতিথিকে বন্দী করে এনে আটক রেখেছো?

রী বললো–হ্যাঁ।

কেন তুমি এ কাজ করলে রী? বললেন রাজা।

রাজকন্যা রী বললো– সম্মানিত অতিথি আমার। আমি তাকে মৌ-এর কাছে ছেড়ে দিতে পারি না বাবা।

রী, হীমা তাকে প্রথম আশ্রয় দিয়েছিলো এবং মৌ-এর সে জীবন রক্ষা করেছিলো–~~~

বাবা, তুমি জানো দেশে সন্তোষজনক কাজের পুরষ্কার যেমন রাজা দেন তেমনি রাজাই তা পান। কাজেই বীর পুরুষটি রাজার প্রাপ্য। সে হীমা বা মৌ-এর অতিথি নয়, রাজপরিবারের অতিথি। তুমি ওর সম্বন্ধে আমাকে কোনো কথা বলোনা বাবা!

রাজা বললেন–যাও সৈনিক, সেই বন্দী বীরকে নিয়ে এসো, আমি তাকেই জিজ্ঞাসা করতে চাই সে কাকে চায়–মৌকে না রীকে।

ওদিকে দুজন ছুটলো মৌকে রাজদরবারে নিয়ে আসার জন্য। এদিকে দুজন সৈন্য চললো বন্দীকে নিয়ে রাজদরবারে হাজির করার জন্য।

দিপালী বিস্ময় নিয়ে রাজকন্যার বান্ধবীদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। অদ্ভুত এ দেশ, অদ্ভুত এ দেশের মানুষ, অদ্ভুত তাদের কার্যকলাপ। সবই আশ্চর্যজনক।

কেমন হাওয়ায় ভেসে ভেসে ওরা হেঁটে যায়, হেঁটে আসে। মোটেই বিলম্ব হয় না এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মৌ তার সঙ্গিনীদের সঙ্গে এসে হাজির হলো।

রাজদরবারে একপাশে রী ও তার সঙ্গিনীগণ।

অপর পাশে মৌ ও তার সঙ্গী-সাথীরা।

রাজা ও হীমা রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট।

এমন সময় শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বনহুরকে দুজন সৈনিক নিয়ে এলো রাজদরবারে।

প্রথমেই বনহুরের দৃষ্টি পড়লো দিপালীর উপর।

দিপালী নীরব।

দুচোখে তার বিস্ময়।

বনহুর দেখলো রাজদরবারে একপাশে রাজকন্যা রী সঙ্গী সাথীদের নিয়ে দন্ডায়মান। অপর পাশে মৌ তার সঙ্গিনীদের নিয়ে দন্ডায়মান রয়েছে।

বনহুর রাজদরবারে প্রবেশ করে সেই দেশের নিয়মানুযায়ী রাজাকে সম্মান জানালো।

বনহুরের দেহ, হাত-পা শৃঙ্খলাবদ্ধ।

তার দুপাশে দুজন সৈন্য সূতীক্ষ্ণধার বর্শা নিয়ে দন্ডায়মান।

রাজা বনহুরকে লক্ষ্য করে কিছু বললেন।

বনহুর সব না বুঝলেও কিছুটা বুঝলো, রাজা বলছেন– হে অতিথি, তুমি আমাদের বরেণ্য জন। তোমাকে আমার দেবতা মনে করি। তোমার দুপাশে দুটি দল দেখছে–একটি রাজকন্যার দল অপরটি এ দেশের সর্দার হীমার কন্যার দল।

এরা দুটি দলই বীরপুরুষ হিসেবে তোমাকে কামনা করে। তুমি কোন্ পক্ষকে সমর্থন করো?

বনহুর চোখ তুলে একবার রাজকন্যা রী ও হীমাকন্যা মৌ-এর দিকে তাকালো। কি জবাব দেবে বনহুর ভেবে পাচ্ছে না। সে একজন মানুষ আর এরা অদ্ভুত মানুষ। পৃথিবীর মানুষের কাছে এরা যেমন বিস্ময় তেমনি এদের কাছে পৃথিবীর মানুষ এক বিস্ময়। রী বা মৌ কাউকেই সে সমর্থন করতে পারে না। আর একটা দলকে সমর্থন করলেই তাকে গ্রহণ করা হলো। অপর দলটি তখন যাবে ক্ষেপে।

বনহুর বিব্রত হলো।

সে তাকালো রী আর মৌ এর দিকে।

দুদলের চোখেমুখেই একটা বিপুল আশা–আকাখা। বনহুরের বড় মায়া হলো ছলছল করছে ওদের চোখ দুটি।

রী আর মৌ কেউ কারও চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। দুজনই চায় বনহুরকে পেতে কিন্তু জানে না ওকে কোনো দিন তারা পাবে না বা পেতে পারে না। তবু একটা বিপুল আশা নিয়ে এসেছে ওরা রাজদরবারে।

বনহুর নীরব।

দিপালী তখন বেরিয়ে এলো সারি থেকে।

মঙ্গল গ্রহের মানুষের ভাষায় বললো–রাজা, আমি এর সমাধান করতে চাই।

রাজা তাকে অনুমতি দিলেন।

দিপালী বললো–যে ঐ খাদে লাফিয়ে পড়তে পারবে সেই জয়ী হবে এবং পাবে ওকে... আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো দিপালী বনহুরকে এবং কথাগুলোও সে ওদের ভাষায় বললো।

রাজা কিছু বলবার পূর্বেই দিপালী রাজার কানে মুখ নিয়ে কিছু বললো, তারপর বললো বনহুরের কানে ফিস ফিস করে।

বনহুর মৃদু হাসলো।

রাজা বললো–হ্যাঁ, ঐ মেয়েটি যা বলেছে তাই করতে হবে। রাজকন্যা রী আর হীমা–কন্যা মৌ তোমরা ঐ মনিসা পর্বতের উপরে যাও এবং সেখান থেকে যে খাদে লাফিয়ে পড়বে অতিথি তার হবে।

রাজকন্যা রী আর মৌ মেনে নিলো কিন্তু তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার ছাপ। ঐ খাদ কত ভয়ংকর তা জানে ওরা তবু তারা নিজ নিজ জেদ বজায় রাখার জন্য মনিসা পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করতে রাজি হলো।

রাজপরিবার এবং হীমা পরিবার ও রাজকন্যা রী এবং হীমা কন্যা মৌ ও তাদের সঙ্গীসাথী সবাই মনিসা পর্বতের ঢালু জায়গা দিয়ে উপরের চূড়ায় উঠে এলো।

বনহুরকেও ওরা নিয়ে এলো সেখানে।

এখন বনহুর শৃঙ্খলমুক্ত।

শুধু কয়েকজন নারী সৈনিক এবং দুজন পুরুষ সৈনিক তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে এলো।

অগণিত জনতা ভীড় জমিয়ে দেখছে।

রূপালী সূর্যের স্নিগ্ধ আলোয় আলোকিত চারদিক। অপূর্ব পরিবেশ।

বনহুরকে নিয়ে বাজি রেখেছে দুটিতরুণী।

অদ্ভুত এ আকাঙ্খা।

দিপালীর মনে আলোড়ন।

নিশ্চয়ই কেউ জীবন দিতে চাইবে না, কাজেই সব সমাধান হয়ে যাবে! রাজঅতিথি রাজদরবারে স্থান পাবে, কারও হৃদয় সিংহাসনে নয়।

কিন্তু আশ্চর্য হলো সবাই এবং দিপালী নিজেও।

রাজা করতালি দেবার সঙ্গে সঙ্গে মৌ ছুটে গিয়ে খাদে লাফিয়ে পড়লো।

কিন্তু খাদে লাফিয়ে পড়বার পূর্বমুহূর্তে বনহুর তাকে ধরে ফেললো শক্ত করে।

করতালিতে ভরে উঠলো চারদিক।

জয়ী হলো মৌ।

দিপালীর মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

বনহুর হেসে বললো–দিপালী, যা ভেবেছিলে তা নয়।

হাঁ, বুঝতে পারলাম রাজকুমার, আপনাকে পাবার বাসনা এদের মৃত্যুকেও হার মানিয়েছে।

বনহুর আর দিপালীর কথা কেউ বুঝতে পারলো না।

রাজকন্যা রী মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মৌ বনহুরকে আলিঙ্গন করে বলে–তুমি আমার! তুমি আমার। দিপালীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো।

রাজকন্যা রী মুখ ঢেকে ছুটে চলে গেছে সেখান থেকে।

রাজা বললেন–মৌ তুমি জয়ী। যাও অতিথি তোমার!

হীমার আনন্দ ধরে না।

সেও হাসিমুখে বনহুরকে আলিঙ্গন করে চুমো দিলো তার ললাটে।

বনহুর কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে দিপালীর দিকে তাকালো।

দিপালী বললো–রাজকুমার।

দিপালী, রাজপ্রাসাদে অপেক্ষা করো। আমি সুযোগের সন্ধানে আছি। বনহুর জানতে তার কথা এরা কেউ বুঝতে পারবে না–তাই বললো সে মনের কথা।

বনহুরের কথাগুলো দিপালী অনুধাবন করলো অন্তর দিয়ে। সে নীরবে মাথা দুলিয়ে বললো–আচ্ছা।

মৌ হীমাসহ বনহুরকে নিয়ে ফিরে চললো তাদের বাসভূমি অভিমুখে।

রাজা ও রাজকন্যা রী সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে গেলো রাজপ্রসাদে।

হীমা বাসস্থানে ফিরে আনন্দ উৎসবের আয়োজন করলো। এমন আয়োজন বনহুর দেখেনি কোনোদিন। ফুল–ফলে ভরা লতা গুল দিয়ে তৈরি আনন্দ উৎসবের মঞ্চ। সোনালী পোশাক পরা তরুণীদল। নানা ধরনের বিস্ময়কর বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নারী-পুরুষ।

এক ধরনের নীলাভো আলোর ঝড়।

সোনালী ঝালর দেওয়া রথ।

বনহুরকে ওরা দেবকুমার সাজিয়ে রথে বসালো। মৌ তার পাশে, মৌ-এর শরীরেও সোনালী পোশাক। রূপালী–সূর্যের আলোতে অপরূপ লাগছে।

সমস্ত শহর পরিভ্রমণ করতে লাগলো রথটা। রথের সম্মুখভাগে কয়েকজন বলিষ্ঠ পুরুষ, যারা অশ্বের কাজ করছে।

বনহুর অবাক হয়ে দেখছে এ সব।

সত্যি তার মনে আজ নতুন এক ভাবের উন্মেষ। বনহুরের মাথায় মুকুট, গলায় হীরার হার।

সোনালী পোশাকে দেহ তার আচ্ছাদিত।

দেবকুমার ছাড়া তাকে কেউ মানুষ বলবে না। স্বাভাবিক বনহুর আজ অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করেছে। সমস্ত রাজ্য পরিভ্রমণ করার পর এক সময় আবার তারা ফিরে এলো হীমার বাসভবনে।

সুন্দর আলোকসজ্জায় আলোকিত চারদিক।

বনহুরসহ মৌ নেমে এলো রথ থেকে।

মৌ-এর হাতের মুঠায় বনহুরের হাত।

হীমা ও তার স্বামী সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে নামিয়ে নিলো বনহুর আর মৌকে।

সখীরা ওদের দুজনকে ঘিরে নৃত্য করে চললো।

মৌ-এর মুখে রাজ্যজয়ের হাসি।

এক সময় নৃত্য শেষ হলো।

মৌ বনহুরের হাত ধরে নিয়ে চললো অন্তপুরের দিকে। সখীরা তাকে বিদায় অভিবাদন জানালো। ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা তীর এসে বিদ্ধ হলো মৌ-এর বুকে। সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠলো মৌ।

বনহুর ধরে ফেললো মৌকে।

তার হাতের উপর তীরবিদ্ধ কপোতর মত ঢলে পড়লো মৌ-এর দেহখানা।

রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো মৌ-এর শুভ্র বসন।

বনহুরের হাত দুখানাও রক্তে ভিজে গেলো।

মৌ একটি কথাও বলতে পারলো না, ধীরে ধীরে চোখ দুটো ওর মুদে এলো।

ততক্ষণে হীমা ও তার স্বামী এসে দাঁড়িয়েছে মৌ-এর পাশে। মৌ-এর রক্তাক্ত দেহের দিকে তাকিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো হীমা।

তার স্বামী দুহাতে মুখ ঢেকে ফেললো।

সখীরা তীব্র আর্তনাদ করে এ ওর গলা জড়িয়ে ধরলো।

বনহুর হতভম্ব হয়ে গেছে।

এমন একটা ঘটনা ঘটবে ভাবতে পারেনি সে। মোমের পুতুলের মত মৌ-এর দেহটা নেতিয়ে পড়েছে বনহুরের হাতের উপর।

চারদিক থেকে ছুটে আসছে লোকজন।

মহিলা বেশি; পুরুষ কম।

সবার চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠেছে।

বনহুরের গন্ড দুফোঁটা অশ্রু মৌ-এর ওষ্ঠদ্বয়ের উপর ঝরে পড়লো। তার বুকটা যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো মুহূর্তে।

হীমা তখন দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছে বনহুরের দিকে।

বনহুর মৌ-এর ছিন্নলতার মত দেহটা হীমার হাতে তুলে দিলো। সবাই যখন মৌ-এর মৃতদেহ নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে তখন বনহুর সবার অলক্ষ্যে সরে পড়লো সেখান থেকে।

মৌ-এর দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে এলেন রাজা স্বয়ং, এলেন তার পারিষদগণ। সবার চোখেমুখে বিষাদের ছায়া।

বনহুর নির্জন এক জায়গায় এসে বসে পড়লো। সত্যি সে মনে বড় ব্যথা পেয়েছে, যার কোনো তুলনা হয় না। গম্ভীর তার মুখমন্ডল।

মৌ-এর চোখ দুটো ভাসছে তার চোখের সামনে। নিষ্পাপ ফুলের মত পবিত্র একটি মুখ…

কেউ যেন কাঁধে হাত রাখলো, চমকে উঠলো বনহুর।

মুখ তুলতেই দেখলো মৌ তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। চোখেমুখে বিপুল উন্মাদনা নিয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে।

বনহুর বললে–মৌ তুমি, তুমি মরোনি!

না, আমি মরিনি। আমি তোমাকে ছেড়ে মরতে পারি না.. মৌ.. আমার হাতে এখনও তোমার রক্ত…

কার সঙ্গে কথা বলছেন রাজকুমার, আমি দিপালী।

মুহূর্তে মৌ হারিয়ে গেলো।

দিপালী দাঁড়িয়ে আছে মৌ-এর স্থানে।

বনহুর নীরবে তাকালো দিপালীর মুখের দিকে।

দিপালী বললো–রাজকুমার, আপনার মাথা ঠিক নেই। আমাকে আপনি মৌ ভেবেছেন।

না, মৌ এসেছিলো দিপালী। তার কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পেলাম।

ওটা আপনার খেয়াল রাজকুমার। মৃত্যু হলে কেউ আর ফিরে আসে না। রাজকুমার, চলুন আমরা পালিয়ে যাই। এখানে আর মন টিকছে না। কতদিন হলো মাটির পরশ পাইনি।

হাঁ চলো দিপালী! উদাস কণ্ঠে বললো বনহুর!

দিপালী বনহুরের হাত ধরে বললো–উঠুন রাজকুমার।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

দিপালী আর বনহুর এগিয়ে চললো আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে।

*

বহুক্ষণ চলার পর দিপালী আর বনহুর একটা ঝরণার পাশে এসে দাঁড়ালো। ঝরণার পানি স্বচ্ছ আর নির্মল। বনহুরের হাত দুখানায় তখনও মৌ-এর রক্ত মাথা রয়েছে। দেহের পোশাকেও রক্তের ছাপ।

বনহুর বললো–দিপালী, মৌ-এর রক্ত এখনও আমার হাতে লেগে রয়েছে। তাই হয়তো মৌ বারবার আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে।

আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে…একটু দাঁড়াও, আমি হাতের রক্ত ঐ ঝরণার পানিতে ধুয়ে ফেলি।

দিপালী দাঁড়িয়ে পড়লো।

বনহুর ঝরণার পানিতে হাত দুখানা পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেললো। মৌ-এর রক্ত ঝরণার সচ্ছ পানিতে লাল রং ছড়িয়ে দিলো।

বনহুর অবাক হয়ে দেখলো মৌ সচ্ছ পানিতে দাঁড়িয়ে হাসছে– আমাকে তুমি ধুয়ে মুছে ফেলতে চাও! আমাকে তুমি কিছুতেই ধুয়ে মুছে ফেলতে পারবে না। আমি যে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে তোমাকে জয় করেছি। রাজকন্যা রী হেরে গেছে.. আমি জয়ী হয়েছি...

মৌ... তুমি ... তুমি ...

দিপালী অবাক হয়ে দেখছিলো বনহুর হাত দুখানা ঝরণার পানিতে পরিষ্কার করতে গিয়ে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে রক্তরাঙা পানির দিকে। হঠাৎ তাকে কথা বলতে দেখে আরও অবাক হলো, মৌ কোথায়! রাজকুমার মৌ-এর নাম ধরে ডাকছে কেন! মৌ কোথায়, মৌ-এর নাম কেন সে ধরলো।

দিপালী এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে– রাজকুমার!

দিপালী, ঐ দেখো, আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম মৌ স্বচ্ছ পানিতে তলিয়ে গেলো।

রাজকুমার আপনার মাথা ঠিক নেই, চলুন এখান থেকে।

হ চল।

বনহুর আর দিপালী উঠে এলো ঝরণার পানি থেকে তীরে। ব্যাকুল কণ্ঠে বললো দিপালী চলুন রাজকুমার, আমরা এই দেশ ছেড়ে চলে যাই।

কিন্তু কি করে যাবো? একটু থেমে বললো বনহুর–আর কোনো দিন ফিরে যেতে পারবো কিনা তাও সন্দেহ।

এগিয়ে চললো বনহুর আর দিপালী।

নির্জন স্থান।

উঁচুনীচু অসমতল পথ।

ঠিক পথ নয় তবু ওরা জনশূন্য স্থান ধরে এগুচ্ছে। মাঝে মাঝে ছোটখাটো পাহাড়–পর্বত নজরে পড়ছে।

পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরণাধারা বয়ে চলেছে।

সুন্দর সচ্ছ রূপালী পানি।

অদ্ভুত অদ্ভুত পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে রূপালী পানি গড়িয়ে যাচ্ছে। ভারী সুন্দর এসব দৃশ্য!

নীরবে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে।

কারও মুখে কোনো কথা নেই।

দিপালী বনহুরের গম্ভীর ভাব লক্ষ্য করে কোনো কথা বলছে না বা বলবার ভরসা পাচ্ছে না। বনহুরকে কোনোদিন সে এতক্ষণ নিঃশব্দে চলতে দেখেনি। চলছে তো চলছেই।

দিপালী বললো–রাজকুমার, আর চলতে পারছি না।

তাহলে? থমকে দাঁড়িয়ে কথাটা বললো বনহুর।

দিপালী বললো–একটু জিরিয়ে নিলে ভাল হতো।

বেশ চলো, ঐ টিলার মত জায়গায় বসে বিশ্রাম নেওয়া যাক।

চলুন রাজকুমার। বললো দিপালী।

বনহুর আর দিপালী এসে টিলাটার পাশে দাঁড়ালো।

হঠাৎ দিপালী বললো–রাজকুমার, দেখুন দূরে একটা কিছু দেখা যাচ্ছে, কোনো জীবজন্তু হতে পারে।

বনহুর লক্ষ্য করলো, দিপালী যা বলছে সত্য।

একটা অদ্ভুত ধরনের জীব গড়িয়ে গড়িয়ে চলাফেরা করছে। বনহুর তার পোশাকের পকেটে হাত দিতে গেলো কারণ ক্ষুদে দূরবীণটা তার পকেটে ছিলো।

বনহুরের সম্বিৎ ফিরে এলো, আপন মনেই বলে উঠলো–এ পোশাক তো আমার নিজের নয়। এ যে মঙ্গল গ্রহের পরিচ্ছদ। দিপালী, আমার জামা কোর্ট প্যান্ট সব রয়েছে হীমার বাসভবনে। আমার কোটের পকেটে রয়েছে দূরবীণ, রিভলভার, ক্ষুদে ওয়্যারলেস আরও কিছু যা অতি প্রয়োজনীয়।

রাজকুমার, আমি আর আপনাকে ওখানে যেতে দেবো না।

কিন্তু আমার এসব না হলে চলবে কেমন করে?

ওখানে গেলে আর ফিরে আসতে পারবেন না। রাজকুমার, যেমন করে থোক আপনাকে পৃথিবীর বুকে ফিরে যেতেই হবে।

হ্যাঁ দিপালী, এ কথা সত্য। আমার আস্তানা, অনুচরগণ আমার তাজ...

রাজকুমার, আপনি এ সব ছেড়ে থাকতে পারেন না।

দিপালী, মনটা বড় অস্থির লাগছে। হয়তো মঙ্গল গ্রহ আবিষ্কার আমার জীবনকে ধন্য করেছে। পৃথিবীর মানুষ এখনও জানে না পৃথিবী ছাড়া আর কোনো গ্রহে মানুষ আছে।

রাজকুমার, আপনি ধন্য, আপনার এই আবিষ্কার একদিন হয়তো পৃথিবীর মানুষের উপকারে আসবে।

ঐ দেখো দিপালী, জীবটা গড়িয়ে গড়িয়ে ওদিকে চলে যাচ্ছে।

পরক্ষণেই চাপাকণ্ঠে বললো–দিপালী, ওটা জীব বা জানোয়ার নয়, ওটা কোন যান... ঐ দেখো ওর চাকার মত কিছু আছে।

তাই তো, সত্যি ওটা একটা যান কিন্তু...

দেখো দেখো, এবার যানটা শূন্যে উড়ে উঠলো।

অবাক হয়ে দেখতে লাগলো বনহুর আর দিপালী। সেই গোলাকার বস্তুটার মধ্য হতে এক ধরনের আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হতে লাগলো। নীলাভ রশ্মি যেন ঐ বস্তুটার চারপাশের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

যান বা বস্তুটা এখন অনেকটা উপরে উঠে এসেছে।

চারদিকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

যানটা ধীরে ধীরে উপরে উঠে গেলো।

তারপর আর দেখা গেলো না, যানটা দ্রুত অন্তর্ধান হলো, চোখের পলকে বলা যায়। বনহুর আর দিপালী তাকিয়ে আছে হতভম্বের মত।

হঠাৎ বনহুর বলে উঠলো–দিপালী, এখন একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। ঐ যানটা মাঝে মাঝে পৃথিবীর বুকে যায়, কাজেই আমরা হয়তো কোনোদিন ফিরে যেতে পারি।

রাজকুমার, এই আশা নিয়েই আমরা প্রতীক্ষা করবো।

এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। জানো দিপালী, এরা পৃথিবীর গাছ–লতাপাতা নিয়ে গবেষণা করছে। পৃথিবীর অনেক কিছু নিয়েই মঙ্গল গ্রহের গবেষকগণ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। তাতে মনে হয় এরাও পৃথিবীর মানুষের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। যে স্থানে যানটা গড়িয়ে গড়িয়ে চলছিলো সেই স্থানে যেতে হবে।

চলুন।

বনহুর আর দিপালী নেমে এলো নিচে।

যে জায়গায় যানটা ছিলো ঐ জায়গায় এসে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো বনহুর। চারপাশে কিছু টিলা বা ছোটখাটো পাথরের স্তূপ রয়েছে। বনহুর সেই পাথরের নুড়িগুলো ভালভাবে দেখছে। অদ্ভুত পাথর, এ ধরনের পাথর পৃথিবীর বুকে দেখা যায় না।

রূপালী সূর্যের আলোতে পাথরের নুড়িগুলো যেন জুলজুল করছে। দিপালী পাথরগুলো নেড়েচেড়ে অবাক হয়ে দেখেছিলো। আশ্চর্য এ পাথর, সুন্দর সচ্ছ

ফটিক পাথরের মত। বনহুরের দৃষ্টি হঠাৎ এক স্থানে এসে থেমে গেলো। একটা আলোকরশ্মি ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসছে ওদিকের বড় একটা পাথরখন্ডের আড়াল থেকে।

বনহুর দিপালীকে ডাকলো–দিপালী ঐ দেখো।

অবাক চোখে দেখালো দিপালী, অদ্ভুত এক রশি বেরিয়ে আসছে ভূগর্ভ থেকে। বনহুর আর দিপালী দেখছে ভারী সুন্দর এই রশি। এ রকম রশ্মি তারা কোনোদিন দেখেনি। বনহুর পাথর খন্ডটার তলদেশ ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো।

ঐ মুহূর্তে একটা শব্দ কানে এলো বনহুরের আর দিপালীর। সাঁ সাঁ শব্দ, কেমন যেন যান্ত্রিক শব্দ বলে মনে হলো তাদের।

বনহুর দিপালীর হাত ধরে সরিয়ে পাথর খন্ডের আড়ালে দাঁড়ালো, চাপাকণ্ঠে বললো–আলোকরশিটা যে ফাটল থেকে বেরিয়ে আসছে ঐ ফাটলটা ধীরে ধীরে বেশি ফাঁক হয়ে আসছে।

সত্যি!

হ্যাঁ, দিপালী ঐ দেখো।

বনহুর আর দিপালী অবাক হয়ে দেখতে লাগলো।

ততক্ষণে ফাঁকটা বেশ বড় হয়ে গেছে।

আলোকরশ্মি আরও বেশি বেরিয়ে আসছে, তার সঙ্গে শব্দটাও বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

বেরিয়ে এলো একটা অদ্ভুত মেশিন।

দুজন অদ্ভুত পোশাকপরা লোক বসে আছে মেশিনটার উপর।

মেশিনটার মাথায় একটা তীব্র সার্চলাইট জ্বলছে। সেই সার্চলাইটের আলো থেকে বিস্ময়কর রশি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

বনহুর ঠোঁটের উপর আংগুল দিয়ে বললো–চুপ করে দেখো এরা কি করে।

দিপালী আর বনহুর দেখতে লাগলো।

সেই অদ্ভুত মেশিনটা উপরে উঠে ঘুরঘুর করে ঘুরপাক খেতে লাগলো।

সার্চলাইটের আলোতে চারদিকের পাথরগুলো যেন জ্বলজ্বল করে জ্বলছিলো।

মেশিনের উপর লোক দুজন সুইচ টিপছে। কিছুক্ষণ মেশিনটা ঘুরে ঘুরে কিছু সন্ধান করলো, তারপর পুনরায় অন্তর্ধান হলো ভূগর্ভে।

ফাটলটা পুনরায় যেমন ছিলো তেমনি হয়ে গেলো, এমন কি পূর্বে ঐ স্থানে কোনো ফাঁক ছিলো তা বুঝাই গেলো না।

বনহুর আর দিপালী কম অবাক হয়নি। পৃথিবীর মানুষের চেয়ে মঙ্গল গ্রহের মানুষের বুদ্ধি কম নয়।

বললো বনহুর–যান্ত্রিক দিক দিয়েও এরা অত্যন্ত সজাগ দেখলাম। দিপালী, নিশ্চয়ই যে যানটা কিছু পূর্বে বেরিয়ে এসেছিলো এবং পরবর্তী যান বা মেশিনটি তারই একটা অঙ্গ বা ঐ ধরনের কিছু হবে।

দিপালী বললো–রাজকুমার, আপনি জানেন না এরা শুধু যান্ত্রিক নয়, এরা অত্যন্ত সজাগ সব ব্যাপারে।

হাঁ দিপালী, তোমার কথা সত্য।

রাজকুমার, আপনাকে আমি এমন এক স্থানে নিয়ে যাবো যেখানে সবই বিস্ময়কর। এ দেশে মানুষ কিভাবে গভীর পানির তলায় মাছের মত সাঁতার কেটে কেটে বাঁচতে পারে দেখলে অবাক না হয়ে পারবেন না।

তাই নাকি? বললো বনহুর।

দিপালী বললো–রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে একটি হ্রদ আছে, সেই হ্রদের মধ্যে আছে কতগুলো মানুষ।

মানুষ আছে হ্রদের মধ্যে? বলো কি দিপালী?

হা রাজকুমার।

তাহলে দেখতে হয়।

সত্যি বড় বিস্ময়কর ব্যাপার, চলুন, রাজকুমার।

এখন নয়, তোমার হ্রদের পানিতে মানুষ বাস করে তা পরে দেখবো। প্রথমে আমি জানতে চাই, যে মেশিনটা একটু পূর্বে ঐ স্থানে ভূগর্ভে অন্তর্ধান হলো সেটা কি, তার চালক কারা এবং তাদের কাজ কি। তুমি এখানে অপেক্ষা করো আমি একা এর সন্ধান নেবো।

কিন্ত.... যদি কোনো বিপদ আসে...

ভয় নেই দিপালী, আমি তোমাকে খুঁজে নেবো।

আমার জন্য নয় রাজকুমার, আপনার জন্য আমার দুশ্চিন্তা, হঠাৎ যদি ভূগর্ভে কোনো বিপদ আসে রাজকুমার, আর আমি আপনাকে হারাতে চাই না।

দিপালীর পিঠ চাপড়ে দিলো বনহুর, কোনো কথা সে বললো না। নীরবে পাথরখন্ডগুলোর ওদিকে চলে গেলো।

যে ফাঁক বা ফাটল দিয়ে তীব্র আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসছিলো সেই জায়গায় ভালভাবে লক্ষ্য করতেই বনহুর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হলো। অদূরে একটি সুড়ঙ্গপথ স্পষ্ট নজরে পড়লো।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে ঐ সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করলো। আশ্চর্য সুন্দর পরিচ্ছন্ন সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। অদূরে বিরাট গহবর। তারপর প্রশস্ত প্রাঙ্গনের মত বিরাট প্রাঙ্গণ।

বনহুর সিঁড়ির কয়েক ধাপ নিচে নামতেই সিঁড়ি তাকে নিয়ে একেবারে শেষ ধাপে পৌঁছে দিলো। বনহুর দেখলে বেশ কয়েকটি যান সেই প্রান্তরে অপেক্ষা করছে।

গভীর নিচে ভূগর্ভে আলোর ছটা ঠিক যেন আলোর বন্যা, এত আলো পৃথিবীর বুকেও বুঝি নেই। সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বনহুর।

প্রতিটি যানের পাশে দুচারজন অদ্ভুত পোশাকপরা লোক কি যেন কাজে তারা মনোযোগী রয়েছে। বনহুরকে তারা লক্ষ্যই করলো না।

বনহুর গভীর মনোযোগে সব দেখতে লাগলো নিজেকে আত্মগোপন করে। তাকে কেউ যেন দেখে না ফেলে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে তার। বিস্ময়কর বটে, যানবাহনগুলো একেবারে পৃথিবীর মানুষের তৈরি বলে মনে হচ্ছে। বনহুর অবাক হয়ে দেখছে।

. ওদিকে একটি বড় মেশিন, যে মেশিনটার মাথার উপর তীব্র সার্চলাইট জ্বলছে। ঐ মেশিনটির আকার এত বড় যার অবস্থান প্রায় এক বা দেড় মাইল জুড়ে। ঐ মেশিনটার দ্বারাই এরা তৈরি করে ছোট ছোট যানগুলো এবং ঐ মেশিনটার মধ্যে রয়েছে ওয়্যারলেস মেশিন।

বনহুর আর দিপালী ঐ মেশিনটার মাথাটুকুই শুধু দেখেছিলো। ফাটলের বা ঐ ভূগর্ভ ছিদ্রপথ দিয়ে মেশিনটার উপরিভাগের কিছু অংশ তুলে দেওয়া হয়েছিলো।

আরও বুঝতে পারে বনহুর ঐ মেশিন দিয়েই যানগুলোকে পাঠানো হয় শূন্যে পৃথিবীর বুকে। বনহুর একবার ঐ যান্ত্রিক বস্তুটার মধ্যে প্রবেশ করতে চায়। সে লক্ষ্য করছে ঐ বিরাট আকার যান্ত্রিক মেশিন বা বস্তুটার কাছাকাছি কিভাবে পৌঁছানো যায়।

ভূগর্ভ হলেও এখানে অক্সিজেনের অভাব নেই। নিঃশ্বাস নিতে মোটেই কষ্ট হচ্ছে না। মঙ্গল গ্রহে কিছু দিন অবস্থান করার পর বনহুর বহু তথ্য সংগ্রহ করেছে, যা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে আজও সম্ভব হয়নি।

লোকগুলো যখন অন্যমনস্কভাবে কাজে নিয়োজিত ছিলো তখন বনহুর অন্যান্য বস্তুর আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ঐ বৃহৎ আকার মেশিনটার নিকটে পৌঁছে গেলো। সেখানে পৌঁছতেই তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো একটা যান্ত্রিক শব্দ।

বনহুর মেশিন বা ঐ বৃহৎ আকর যান্ত্রিক বস্তুটার ভিতরে প্রবেশ করার পথ খুঁজতে লাগলো। ওদিকে এগুতেই দেখলো একটা সিঁড়ি এবং সিঁড়ির উপরে একটা বড় ফুটো।

প্রসন্ন হলো বনহুরের মুখমন্ডল।

সে এদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলো এবং সেই বড় ফুটোর মধ্যে প্রবেশ করলো।

ও পাশেও ঠিক তেমনি একটি সিঁড়ি।

বনহুর সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপাশে নেমে গেলো নিচে মেশিন বা ঐ যান্ত্রিক বস্তুটার মধ্যে। দেখলো বনহুর বিরাট ব্যাপার, কত রকম মেশিন চলছে। নানা ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে।

যে লোকগুলো কাজে নিয়োজিত তাদের সবার মুখে মুখোশ রয়েছে। তারা যে পরিচ্ছদ পরে রয়েছে তা তাদের সমস্ত দেহকে আবৃত করে রেখেছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কিছুই নজরে পড়ছে না। মুখোশটা আলখেল্লা আবৃত দেহের উপরের মুখে আটকানো রয়েছে।

বনহুর অবাক না হয়ে পারলো না, এমন ধরনের সূক্ষ কাজ ইতিপূর্বে সে দেখেনি। সুন্দরভাবে মনোযোগ সহকারে কাজ করছে। বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে।

বনহুর আড়ালে আত্মগোপন করে সব দেখতে লাগলো। গভীরভাবে চিন্তা করে অনুমান করলো এরা ভূগর্ভে এই ধরনের যান্ত্রিক মেশিন দ্বারা নানা ধরনের মেশিন তৈরি করে চলেছে।

সবাই মনোযোগ সহকারে কাজ করছে। নানা ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি করে যাচ্ছে কিন্তু এরা পৃথিবীর মানুষের মত নয়। এরা শুধু কাজ ভালবাসে, বিশ্রাম এরা খুব কমই করে।

একটু অদ্ভুত ধরনের মেশিন তৈরি নিয়ে এরা ভীষণ ব্যস্ত আছে বলে মনে হলো। বনহুর এত বেশিক্ষণ এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকার পাত্র নয়, সে বিরাট যান্ত্রিক যানটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো এবং নিচে নামতেই হঠাৎ কে যেন তাকে জড়িয়ে ধরলো।

বনহুর ফিরে তাকাতেই অবাক হলো।

দুখানা হাত তাকে বেষ্টন করে ধরেছে।

একি, এ হাত যে লোহার হাতের মত শক্ত। বনহুর কিছুতেই বেষ্টনী মুক্ত করতে সক্ষম হলো না। লক্ষ্য করলো বনহুর তার দেহটাকে নিয়ে হাত দুখানা শুন্যে উঠে যাচ্ছে।

এবার বনহুর বুঝতে পারলো হাত দুখানা কোনো মানুষের নয়, যান্ত্রিক। তাকে যান্ত্রিক হাত দুটি পুনরায় ঐ বৃহৎ মেশিন বা যান্ত্রিক বস্তুটার মধ্যে তুলে নিলো।

বনহুর একচুল নড়তে পারছে না।

তাকে এমন এক স্থানে হাত দুটি নিয়ে হাজির করলো যা এক বিস্ময়কর জায়গা।

বনহুর চোখ তুলতেই দেখলো একটা লোক বসে আছে সম্মুখস্থ আসনে। তার সামনে নানা ধরনের সুইচ রয়েছে। সম্মুখস্থ আসনে বসে লোকটা সুইচ টিপছে আর যান্ত্রিক হাত দুখানা কাজ করে চলেছে। এমন একটা অদ্ভুত যন্ত্র পৃথিবীর বুকেও নজরে পড়া কঠিন।

বনহুরকে হাতখানা এবার মুক্ত করে দিলো।

অবশ্য সম্মুখস্থ আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিই সুইচ টিপে বনহুরকে মুক্ত করলো।

এরপর সে বললো–তুমি কে? তুমি কোথা থেকে এসেছো? এখানে কেমন করে প্রবেশ করলে?

কথাগুলো বনহুরের বুঝতে কষ্ট হলো না, কারণ এ কদিনে এ দেশের মানুষের ভাষা কিছু কিছু সে এবং দিপালী শিখে নিয়েছিলো।

বনহুর ভাঙা ভাঙা শব্দে বললো–আমি একজন মানুষ। আমি এসেছি পৃথিবী থেকে! এখানে প্রবেশ করেছি নিজের ইচ্ছায়।

বললো লোকটা–তুমি অন্যায় করেছো! এখান থেকে কোনো দিন ছাড়া পাবে না। এখানে তোমাকে চিরদিন আটক করে রাখা হবে।

বনহুর বললো–চমৎকার, আমি তাই থাকতে চাই। আমি পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাই না।

লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছিলো না তবু বেশ বোঝা গেলো সে এ কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ লোকটা উঠে দাঁড়ালো এবং এগিয়ে এলো বনহুরের পাশে। প্রচন্ড এক ঘুষি লাগালো বনহুরের চোয়ালে।

বনহুর একটু হাত বুলিয়ে নিলো নিজের চোয়ালটার উপরে। লোকটার হাতখানায় সে ভীষণ ব্যথা অনুভব করছে, তা তার আচরণে বোঝা গেলো। কারণ সে আরেক হাত দিয়ে নিজের ঐ হাতখানার উপর বুলোত লাগলো।

বনহুর একটু হাসলো।

লোকটা এবার একটা সুইচ টিপলো। সঙ্গে সঙ্গে আবার বেষ্টনী দিয়ে ধরে ফেললো হাত দুখানা বনহুরকে।

এবার বনহুর একচুল নড়তে পারছে না।

আবার বনহুরকে হাত দুখানা শূন্যে তুলে নিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে সেই বৃহৎ আকার মেশিনটার মধ্য থেকে বাইরে আনা হলো।

তারপর একটি সুড়ঙ্গপথ।

হাত দুখানা তাকে নিয়ে সেই সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। কোথায় তাকে নিয়ে চলেছে কে জানে! এমন ধরনের সুড়ঙ্গ মঙ্গল গ্রহের মানুষ তৈরি করতে পারে এ যেন বনহুরের কল্পনার বাইরে।

*

বনহুর শত চেষ্টা করেও হাত দুখানা থেকে নিজকে মুক্ত করতে পারলো না।

জাভেদ, জানি না তোমার বাপু জীবিত আছে না মৃত্যু বরণ করেছে। সে যখন প্যারাসুট নিয়ে প্লেন থেকে লাফিয়ে পড়েছিলো তখন প্লেনখানা সমুদ্রের উপর দিয়ে যাচ্ছিলো। কথাগুলো বলে আশা তাকালো সম্মুখে গাছের গুঁড়ির উপরে বসা জাভেদের দিকে।

জাভেদ মনোযোগ সহকারে সব শুনছিলো। তার বাপু এবং আশা লন্ডন থেকে ফিরবার পথে যা যা ঘটেছিলো সব আশার মুখে শুনে নিয়েছে সে। যদিও জাভেদ

আশাকে পেয়ে খুশি হয়েছে তবু একেবারে আনন্দিত হতে পারেনি, কারণ তার বাপু ফিরে আসেনি এটা বড় দুঃখের কথা। বিশেষ করে মার মুখ অশ্রুভারাক্রান্ত দেখে জাভেদ মোটেই শান্তি পাচ্ছিলো না।

নূরী নিজে আশার সঙ্গে দেখা করবে বলে রওয়ানা দিয়েছিলো কিন্তু জাভেদ তাকে বাঁধা দিয়েছে। আশার মুখে শোনা সব কথাই জাভেদ নুরীর কাছে ব্যক্ত করেনি। আর করেনি বলেই নূরী কিছুটা স্থির আছে। সে যদি জানতো তার হুর সমুদ্রগর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাহলে তার পক্ষে নিশ্চুপ থাকা মোটেই সম্ভব হতো না। প্রাণপ্রিয় স্বামীর সন্ধানে সে পাড়ি জমাতে বিদেশের পথে।

তবু নূরী আশার ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠেছে, একবার দেখা না করে সে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না। তার হুরের সংবাদ পাবে নূরী সেখানে।

জাভেদ মায়ের মনোভাব জানতে পারে এবং সে মাকে ক্ষান্ত করে, সান্ত্বনা দিয়ে বলে–আম্মি, আমি সব সংবাদ তোমাকে জানাবো। বাপুর জন্য তোমার একটুও ভাবতে হবে না।

কথাটা জাভেদ মুখে হাসি টেনে বললেও মনটা তার বেশ অস্থির লাগছিলো, কারণ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়।

আশা আজ যখন জাভেদকে কথাগুলো বললো তখন জাভেদ কোনো কথা বলতে পারলো না। সে চুপ করে শুনে যাচ্ছিলো। তবে কি সত্যি তার বাপু আর ফিরে আসবে না?

জাভেদকে চিন্তাযুক্ত দেখে আশা বলে উঠলো–জাভেদ, আমার মন বলছে সে জীবিত আছে। আবার সে ফিরে আসবে, কারণ বনহুর কোনো অন্যায় করেনি যার জন্য তাকে মৃত্যু গ্রাস করবে।

ব্যথাভরা হাসি হেসে বললো জাভেদ– আশা আম্মু, তুমি গভীর চিন্তায় সম্বিৎ হারিয়ে ফেলছে। মৃত্যু এমন একটা জিনিস যা কোনো মহৎ ব্যক্তিকেও পরিত্রাণ দেয় না। সৎ–মহৎ লোকও সময় হলে পরপারে পাড়ি জমায়, কেউ তাকে ধরে রাখতে পারে না। এটাই দুনিয়ার নিয়ম।

দুনিয়ার নিয়ম আমি জানি কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না বনহুর এত শীঘ্র আমাদের ত্যাগ করে চলে যাবে। না না, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।

তাই যেন হয় আশা আম্মু, তাই যেন হয়।

জাভেদ কথাটা বলে উঠে দাঁড়ালো, তারপর সে বেরিয়ে গেলো আশার উঠান থেকে।

ঐ মুহূর্তে কয়েকজন গোয়েন্দা পুলিশ গোপন সূত্রে জানতে পেরে হাজির হয়েছিলো। আশার কুটিরের চারপাশে ঘিরে ছিলো তারা। উদ্দেশ্য জাভেদকে গ্রেপ্তার করা।

নূর নিজে পুলিশ মহলকে পরিচালনা করছিলো। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সে জাভেদের সন্ধান রেখেছিলো এবং সে জয়যুক্ত হয়েছে এ ব্যাপারে। তার নিযুক্ত কয়েকজন বিশ্বস্ত লোকের সূক্ষ্ম অনুসন্ধান জাভেদকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছে।

নুর নিজেও পুলিশমহলের সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে ছিলো। জাভেদ বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশমহলকে ইংগিত করলো একটি জাল তার মাথার উপর ছড়িয়ে দেবার জন্য।

পুলিশবাহিনী মূরের ইংগিত পাওয়া মাত্র মজবুত কর্ডসূতার জালখানা ছড়িয়ে দিলো তার মাথার উপর।

জাভেদ আচমকা এমন একটা অবস্থার সম্মুখীন হবে ভাবতে পারেনি, তাই প্রস্তুত ছিলো না সে। একটু পূর্বে আশার সঙ্গে যে আলাপ হচ্ছিলো তা নিয়েই জাভেদ ভাবছিলো এবং অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো।

জালের আবেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে সিংহশাবক যেমন ফুঠে ওঠে, তেমনি গর্জন করে উঠলো জাভেদ। কিন্তু কোনো উপায় তার ছিলো না, কারণ এ মুহূর্তে তার ছোরাখানাও ছিলো না।

আশা ভিতরে থাকার জন্য একটুও আঁচ করতে পারলো না। অবশ্য আশার কুটির থেকে কিছুটা দূরত্ব ছিলো তাই আশা ঠিক বুঝতে পারলো না। সে নীরবে কুটিরে প্রবেশ করলো।

জাভেদ জালে জড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশবাহিনী তাকে ঘিরে ফেললো। প্রত্যেকেই রাইফেল বাগিয়ে ধরলো জাভেদের বুক লক্ষ্য করে।

নূর নিজে রিভলভার ধরলো এবং কঠিন কণ্ঠে বললো–একচুল নড়বে না, তাহলে এক্ষুণি তোমার ভবলীলা সাঙ্গ হবে।

জাভেদ নিশ্চুপ রইলো, কারণ সে এত বেশি ক্রুদ্ধ হয়েছিলো নূরকে দেখে যে তার সমস্ত শরীর ফুলে ফুলে উঠছিলো। দাঁতে দাঁতে পিষে নিজকে সংযত করে নিচ্ছিলো।

ততক্ষণে তাকে জালে জড়িত অবস্থায় পুলিশবাহিনী তুলে নিলো অশ্বপৃষ্ঠে। মুখমন্ডলে কিছু চাপা না দিলেও জাভেদ একটুও শব্দ করলো না। অবশ্য ইচ্ছা করেই সে কোনো শব্দ উচ্চারণ করলো না, কারণ সে বিপদে পড়েছে জানতে পারলে আশা চুপ থাকবে না, হয়তো তার কোনো বিপদ আসবে অহেতুক। তাই জাভেদ কোনো শব্দ না করেই চেষ্টা করলো পুলিশবাহিনীর হাত থেকে নিজকে মুক্ত করার।

কিন্তু জাভেদ পরাজিত হলো নূরের কাছে।

পুলিশবাহিনী নূরের ইংগিতমত কাজ করলো।

জাভেদকে বন্দী সিংহের মত আটক করে নিয়ে চললো শহর অভিমুখে।

শুধু পুলিশমহল নয়, সমস্ত কান্দাই–এ মহা হৈ চৈ পড়ে গেলো। এক অদ্ভুত লোক ধরা পড়েছে, যার দেহে কোনো পরিচ্ছদ নেই। শুধু প্যান্ট ছাড়া। অদ্ভুত সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ।

আটক ব্যক্তিকে দেখবার জন্য কান্দাই পুলিশ অফিসে হাজার হাজার লোক সমবেত হতে লাগলো। সবার মুখে একই কথা, কান্দাই জঙ্গল থেকে একটি জংলী বীরকে ধরে এনেছে প্রখ্যাত গোয়েন্দা নূরুজ্জামান চৌধুরী।

শহরের লোকজন ছাড়াও দূর দূরান্ত থেকে জাভেদকে দেখার জন্য জনসমাবেশ হতে লাগলো। পুলিশমহল বাধা দিয়েও তাদের ক্ষান্ত করতে পারছে না।

জাভেদ নিশ্চুপ।

দু হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে চুপচাপ রইলো।

একটি কথাও সে বলছে না বা চোখ তুলে কাউকে দেখছে না। জাভেদ শুধু রাগে দুঃখে ভিতরে ভিতরে ফোঁস ফোঁস করছে।

জাভেদকে নিয়ে পুলিশমহলে নানা রকম আলোচনা চলছে। তাকে কি করা হবে, যাবজ্জীবন কারাদন্ড না ফাঁসি দেওয়া হবে।

যতদিন বিচার হবে ততদিন বন্দীকে হাঙ্গেরী কারাকক্ষে আটক করে রাখা হবে। বিচার মুহূর্তে তাকে আনা হবে কান্দাই হাইকোর্টে।

বিচারপতি মোসিহলোরী স্বয়ং বিচারভার গ্রহণ করেছেন। তিনি এই জংলী বীর পুরুষের বিচার করবেন।

নূরুজ্জামান চৌধুরীকে কান্দাই সরকার পুরস্কার প্রদান এবং তাকে বীর উত্তম পদবী প্রদান করবেন বলে ঘোষণা করলেন।

এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো সারা দেশে।

মনিরাও শুনলো।

সে নূরকে ডেকে পাঠালো।

মায়ের ডাক না শুনে পারলো না নূর। নিজে সে গাড়ি ড্রাইভ করে হাজির হলো চৌধুরী বাড়িতে।

মনিরা সন্তানকে পেয়ে খুশি হলো, কাছে এসে বললো–শুনলাম কান্দাই জঙ্গল থেকে এক জংলী ধরে এনেছিস?

শুধু জংলী নয় আম্মি, জংলী বীর।

বয়স তার কেমন?

ধরো আমার চেয়ে দুচার বছর ছোট হবে।

এতটুকু ছেলের এত তেজ? তাকে আটক করতে তোকে নাকি হিমসিম খেতে হয়েছিলো?

কতকটা তাই। অতি কৌশলে তাকে গ্রেপ্তার করেছি আম্মি।

কি অপরাধ সে করেছিলো তোর কাছে?

একটু হেসে বললো নূর–ঐ জংলী বীরটাই তোমার ছেলেকে আটক করেছিলো।

এ সেই জংলী তরুণ?

হাঁ আম্মি, ঐ ছেলেটা শুধু শক্তিশালী পুরুষই নয় সে অত্যন্ত সুচতুর। আমার শয়নকক্ষেও সে কৌশলে প্রবেশ করেছিলো, তারপর আমাকে সে নিদ্রিত অবস্থায় ... কথা শেষ না করে দাতে দাঁত পিষলো নূর।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টি তার সীমাবদ্ধ হলো সামনের দেয়ালে।

মনিরা বুঝতে পারলো যে জংলী যুবক নূরকে নিদ্রিত অবস্থায় বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলো এই সেই জংলী তরুণ। মনিরা নিজেও রাগতভাবে বললো–ওকে কিছুতেই মুক্তি দিও না নূর। আমি চাই না সে মুক্তি লাভ করে আবার তোমার ক্ষতি সাধন করুক।

আম্মি, তুমি কিছু ভেবো না, ও আর মুক্তি পাবে না। আমি ওকে হাঙ্গেরী কারাগারে আটক রাখার জন্য কান্দাই সরকারকে অনুরোধ করেছি। এ ছাড়া বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদন্ড হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মনিরা বললো–যাক বাঁচা গেলো…আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছিলো।

কেন আম্মি?

কারণ যদি সে ছাড়া পায় তাহলে সে ভীষণ প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে।

আর পারবে না আম্মি।

কিন্তু কে সে এমন এক তরুণ যার এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং শক্তি?

আম্মি, তুমি তাকে দেখোনি। অদ্ভুত সে তরুণ।

সত্যি ওকে আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করছে।

এমন ইচ্ছা কোনোদিন মনে স্থান দিও না আম্মি। মানুষ নয় অমানুষ সেকঠিনভাবে কথাটা বললো নূর।

মনিরা জানে নূর যা করে তা খুব চিন্তা করেই করে, তা ছাড়া নূরের প্রতিটি কাজ সূক্ষ্ম। তবু মনিরার ভাবনার অন্ত নেই কখন কোন বিপদ আসে কে জানে। স্বামীর চিন্তায় সে সর্বদা অস্থির, জীবনের সুখশান্তি সব হারিয়ে গেছে অশান্তির অন্তরালে। শুধু বেঁচে আছে মনিরা রাশিকৃত ভাবনা নিয়ে। নারীর জীবনে স্বামীই সম্বল, স্বামীই বন্ধু সখা সঙ্গী। মনিরা আজকাল বড় গম্ভীর হয়ে পড়েছে। সর্বদা পুরোনো স্মৃতিগুলো সে মন্থন করে চলে। এতে সে শান্তি পায় তৃপ্তি পায়। নির্জনে বসে ভাবে মনিরা, ঐ একটি মুখ সর্বদা তার মানসপটে ভেসে ওঠে। সেই হাসি, সেই কণ্ঠস্বর তার মনে প্রতিধ্বনি জাগায়।

নারী হয়ে তার জন্ম হয়েছে। নারীর ধর্ম স্বামীর সংসারকে সুখময় করে তোলা। সেবা যত্ন প্রেম ভালবাসা দিয়ে স্বামীকে পরিতৃপ্ত করা। মনিরার সব ছিলো, সব আছে তবু সে সব থেকে যেন বঞ্চিত।

মনিরাকে ভাবতে দেখে বললো নূর– কি এত ভাবছো আম্মি?

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে বললো মনিরা কিছু না।

নূর বললো– আম্মি, তুমি কিছু না বললেও আমি জানি তোমার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। এত কেন ভাবো বলোতোর

ভাবনা কি সাধে হয়। তোমার আব্বু আমাকে চিরদিন জ্বালিয়ে এলো, কোনদিন শান্তি পেলাম না।

আম্মি তুমি আব্বুকে নিয়ে বড় ভাবো। তাঁর যা করার তিনি করে যাচ্ছেন। তুমি বেশ আছে আম্মি।

— তুই বুঝবি না নূর স্বামী মেয়েদের কত বড় সম্পদ। যে সংসারে স্বামী অমনোযোগী সে। সংসার কোনোদিন শান্তিময় হতে পারে না।

আম্মি, তুমি জানো না আব্বু কোনোদিন অমনোযোগী নন। তার আদর্শ পুরুষ জাতির এক শুভ নিদর্শন। আব্বুকে আমি জানতাম না…

নুর! নূর তোর আব্বুকে তুই চিনতে পেরেছিস তাহলে?

হাঁ আম্মি, আমি তাঁর আসল রূপ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। আমার আব্বু দস্যু হতে পারেন কিন্তু তিনি অমানুষ নন, তাঁর বিবেক বিবেচনা আজ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। তার বুদ্ধিদীপ্ত কার্যকলাপে দেশবাসী মুগ্ধ।

নূর, চিরদিন সে নিজের সুখশান্তি বর্জন করে অসহায় মানুষের জন্য সগ্রাম করে চলেছে। বিশ্বের নিপীড়িত শোষিত জনগণের জন্য সে নিজের জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত নয়।

আমি একদিন জানতাম দস্যু বনহুর দেশের শত্রু, দশের শত্রু, তার নাম শুনলে আমার শরীরের রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠতো, আমি তাকে যেমন করে পারি গ্রেপ্তার করবে শপথ গ্রহণ করেছিলাম….

হাঁ, যখন ছোট্ট শিশু তুই, তখন হতেই আমি লক্ষ্য করেছি তোর মধ্যে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের বিপুল এক বাসনা। একটু থেমে বললো মনিরা–এটা তোর অপরাধ না নূর, তোর মধ্যে এক কর্মনিষ্ঠার, কর্তব্যের উন্মাদনা ছিলো তাই…

আম্মি, সে কথা স্মরণ হলে আজ আমার মন ব্যথায় গুমড়ে কেঁদে ওঠে। না জেনে আমি ভীষণ ভুল করেছি, তার প্রতি আমি অন্যায় করেছি। আব্বু কোনোদিন আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন না।

না নুর, না। তিনি কোনোদিন তোর প্রতি ক্ষুণ্ণ হতে পারেন না। কারণ তার মন অনেক বড়, অনেক উদার।

হাঁ, আমি জানি। আব্বুর কাছে তাই আমি অপরাধী। আম্মি, তুমিই চিনেছিলে, তাই আব্বুকে তুমি কোনোদিন অনাদর করোনি।

নূর, আমি ধন্য তাকে আমি স্বামীরূপে পেয়েছি। তবে মাঝে মাঝে মন গুমড়ে কেঁদে ওঠে, আর দশ জন মেয়ের মত আমি তাকে কাছে পেলাম না সংসারের প্রয়োজন ক্ষেত্রে।

আম্মি তুমি দুঃখ করো না। তোমার আদর্শ নিয়ে নারীজাতি আজ ধন্য হবে তোমার স্বামী নিজের জন্য নয়, দেশের জন্য, দেশের নিপীড়িত জনগণের জন্য সংগ্রাম করে চলেছেন। পুলিশমহল যা পারে না তা তিনি সমাধা করেন। দেশ আজ মহা সংকটময় অবস্থায় উপনীত। এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মানুষ নামী জীব দেশের সম্পদ আত্মসাৎ করার নেশায় উন্মত্ত। তারা চোখে রঙিন ফানুষ দেখছে। স্বর্গসুখে বাস করেও তারা আরও সুখের আশায় শার্দুলের মত আঁচড় কেটে বেড়াচ্ছে। ক্ষতবিক্ষত জনগণের রক্ত শোষণ করে নিচ্ছে হায়নার মত।

নূর, তুই এসব মানিস?

পৃথিবীর দুটো রূপ আছে–একটি মধুর মনোরম, অপরটি অমাবস্যার অন্ধকারের চেয়েও ভয়ংকর কুৎসিত কদাকার। পৃথিবীর এই দুই রূপ সৃষ্টিকারী হলো মানুষনামী জীবগুলো। এক শ্রেণীর মানুষ সমাজে সাধুতার মুখোশ পরে সৎ–মহৎ ব্যক্তির ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছে, আর এক শ্রেণীর মানুষ পথের ধূলায় লুটোপুটি খাচ্ছে। ঐসব সৎ–মহৎ ব্যক্তিরা মুখোশধারী জীবগুলোকে সমাজ শ্রেষ্ঠ আসনে স্থান দিয়ে তাদের পদসেবায় মত্ত। এই মানুষনামী জীবগুলো যদি কোনো স্থানে গমন করে তাহলে ধন্য হয় সে স্থানের মাটি। পুলিশমহল এসব মুখোশধারীদের সমীহ করে চলে, শ্রদ্ধায় নতজানু হয়। কতগুলো স্বার্থান্বেষী কুকুর এদের পেছনে পেছনে হন্যে হয়ে ছোটে কিছু পুরস্কারের আশায়।

নূর, এ যে তোর বাপুর কথাগুলো তুই উচ্চারণ করছিস। তুই না তোর আব্বুর কথাগুলোকে অহেতুক বলে উড়িয়ে দিতিস?

তখন এত বুঝতাম না আমি! এখন আমার চোখের সামনে সব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, মানুষনামী জীবগুলোর মুখোশের অন্তরালের রূপ উদঘাটিত হয়েছে আমার কাছে। পুলিশমহলের লোকগুলো সব জানে বোঝে, ঘৃণাও করে অন্তর দিয়ে কিন্তু তারা বধির, কারণ তারা বুঝেও না বোঝার ভান করে সেলাম ঠোকে বুটে বুটে ঠুকে।

সত্যি নূর, তোর কথা সব সত্যি কিন্তু তুইতো ওদের…

গোলাম নই আম্মি, আমি একজন ডিটেকটিভ। অন্যায়কে খুঁজে বের করাই আমার কাজ। তুমি তো জানো আমি আব্বুকে কর্তব্যের খাতিরে আটক করেছিলাম। অবশ্য পরে আমার অনুশোচনা হয়েছিলো যখন জানলাম আব্বু

দস্যু হলেও তিনি একজন মহান পুরুষ যার দয়ায় হাজার হাজার অসহায় মানুষ দুবেলা দুমুঠো খেতে পায়, পরতে পায়। তাছাড়া তিনি সৎ উপায়ে উপার্জনকারী ব্যক্তিদের উপর কোনোদিন অন্যায় আচরণ করেন নি।

এ কথা সত্য। সে কোনোদিন অসহায় মানুষের প্রতি অন্যায় আচরণ করেনি। শুনেছিলাম। মন্থনা দ্বীপে হাজার হাজার নিপীড়িত মানুষ ওর প্রতীক্ষায় প্রহর গোনে। ওর অনুচরগণ গিয়ে তাদের খাদ্যবস্তু দিয়ে আসে, তাই খেয়ে–পরে ওরা বেঁচে থাকে।

শুধু মন্থনা দ্বীপ নয় আম্মি, পৃথিবীর বহু দুঃস্থ এলাকার, বস্তি এলাকার অগণিত জনগণের মুখে আব্বু হাসি ফুটিয়েছেন। আজ আব্বুর জন্য তারা অফুরন্ত দোয়া করছে। আম্মি, জানি না আব্বু কোথায় আছেন, কেমন আছেন।

নূর, আমার মন বলছে সে ভাল আছে, আবার সে ফিরে আসবে।

নূর আনমনা হয়ে যায়।

এখানে মনিরা আর নূর যাকে নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলো, সে তখন পৃথিবীর বুক থেকে অনেক অনেক দূরে মঙ্গল গ্রহে।

রাজ প্রাসাদে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বন্দী অবস্থায়। সেখানে তার বিচার হবে। বিচারে তার শাস্তি হবে–রাজকন্যার দাস হিসেবে তাকে থাকতে হবে।

দিপালীও হাজির রাজ দরবারে।

অবশ্য অনেক কষ্ট করেই দিপালী খুঁজে পেয়েছে রাজপ্রাসাদ। ভাগ্যিস মঙ্গল গ্রহের কিছু ভাষা সে শিখে নিতে সক্ষম হয়েছিলো তাই সে ব্যবহার করে অন্যান্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো এবং তারা তাকে রাজপ্রাসাদে হাজির করেছিলো।

দিপালী দূর থেকে বনহুরকে দেখে আনন্দে অধীর হলো কিন্তু নিজকে সে কঠিনভাবে সংযত রাখলো।

বিচার চলাকালে দিপালী পৌঁছেছিলো, তাই সে সব অনুধাবন করলো।

রাজকন্যা রীর চোখেমুখে উচ্ছ্বাস।

জ্বলজ্বল করে জ্বলছে তার চোখ দুটো।

যা সে চেয়েছিলো তাই পেলো।

বনহুরকে পাবার জন্য একদিন রী উম্মত্ত হয়ে উঠেছিলো, হত্যা করেছিলো মৌকে। আজও মৌ-এর আত্মা বনহুরকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। যখনই সে একা থাকে তখনই মৌ এসে তার চোখের সামনে দাঁড়ায়। করুণভাবে তাকিয়ে থাকে, সুন্দর ফুলের মত মিষ্টি একটু হাসি লেগে থাকে তার ঠোঁটের ফাঁকে।

বনহুর তখন আনমনা হয়ে যায়, ভুলে যায় বাস্তব জগৎকে।

আজ বিচার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন বনহুরের হাতের বন্ধন মুক্ত করে দেওয়া হলো তখন রী তার সঙ্গিনীদের কিছু বললো।

সঙ্গিনীরা এসে বনহুরকে ঘিরে দাঁড়ালো। এতক্ষণ দিপালী সব লক্ষ্য করছিলো দূর থেকে, এখন সেও রীর সঙ্গিনীদের সঙ্গে বনহুরের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। বনহুর তাকালো দিপালীর দিকে।

এখন বনহুরের দেহে মঙ্গল গ্রহের শুভ্র পোশাক।

গলায় মূল্যবান নীলমনি মুক্তাহার। নীলমনি হার থেকে উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এই নীরমনি হার রাজা তাকে উপহার দিয়েছিলেন ভয়ংকর জীবটাকে হত্যা করার জন্য।

বনহুর তা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছিলো সেদিন।

বনহুরের শরীরে এখনও মঙ্গল গ্রহের পোশাক পরিহিত ছিলো এবং সে শুভ্র পোশাকে ছিলো মৌ-এর রক্তের ছাপ। এ রক্ত তাকে প্রতি মুহূর্তে বিচলিত করছিলো। বনহুর চায় তার পৃথিবীর পরিচ্ছদ। এ পরিচ্ছদ সে ত্যাগ করে মুক্তি পেতে চায়।

দিপালী যখন এসে দাঁড়ালো রীর সঙ্গিনীদের মধ্যে তখন বনহুর বললো– দিপালী, আমার নিজের পরিধেয় বস্তুগুলো সংগ্রহ করে রেখো, এ পরিচ্ছদ

আমার অসহ্য লাগছে।

দিপালী বললো–আচ্ছা রাজকুমার, আমি ঠিকমত আপনার পোশাকগুলো খুঁজে রাখবো।

বনহুরকে নিয়ে ওরা চলে গেলো রাজদরবার থেকে রাজপ্রাসাদে, যেখানে রী তার সঙ্গিনীদের নিয়ে আনন্দ বিনোদন করে থাকে।

একটি বৃক্ষের সঙ্গে বনহুরকে বেঁধে রাখা হলো প্রথমে, তারপর রীর সঙ্গিনীরা তাকে নিয়ে চললো রীর বিশ্রামকক্ষের দিকে।

বনহুর নিশ্চুপ গোবেচারার মত এগিয়ে চলল। এক ঝাঁকুনি দিলেই তরুণীদল এক একজন ছিটকে পড়বে দশ হাত দূরে কিন্তু বনহুর তা করবে না। সে কতকটা নেকা সেজে দেখতে চায় এরা তাকে রাজকন্যা রীর কাছে নিয়ে গিয়ে কি করে।

সঙ্গিনীদলের সঙ্গে দিপালীকে না দেখে একটু বিব্রত হলো বনহুর তবু সে নীরব রইলো।

ওরা বনহুরকে নিয়ে হাজির করলো রাজকন্যা রীর কক্ষের দরজায়।

পৃথিবীর লোকালয় কক্ষের মত কক্ষ কিন্তু কোনো ছাদ নেই। উপরে আবরণশূন্য–আলোর বন্যা। মনোরম পাথরে তৈরি দেয়ালে মনিমুক্তাখচিত কারুকার্য। সম্মুখে বাগান, বাগানে বেগুনী ফুলের সমারোহ।

সঙ্গিনীগণ বনহুরকে নিয়ে রাজকন্যার কক্ষে প্রবেশ করলো। অবাক হয়ে দেখলো বনহুর রাজকন্যা রী একটি অদ্ভুত শয্যায় শায়িত। তার শিয়রে দন্ডায়মান এক পুরুষ, তার হাতে চামর। লোকটা ধীরে ধীরে চামর দোলাচ্ছে।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করে অভিনব কায়দায় কুর্ণিশ জানালো রীকে।

রী সোজা হয়ে বসলো।

সঙ্গিনীগণ লোকটার হাত থেকে চামর নিয়ে বনহুরের হাতে দিয়ে তাদের নিজের ভাষায় বললো–এই নাও এই চামর। আজ থেকে ওর ছুটি আর তোমার এ কাজ। যতক্ষণ রাজকন্যা রী বিশ্রাম করবে তুমি চামর দোলাবে বুঝলে?

বনহুর মৃদু হেসে চামরখানা গ্রহণ করলো।

এবার পূর্বের সেই লোকটি বেরিয়ে গেলো কুর্ণিশ জানিয়ে।

সঙ্গিনীরাও কুর্ণিশ জানিয়ে প্রস্থান করলো যে পথে তারা কক্ষে প্রবেশ করেছিলো সেই পথে।

ওরা চলে যাবার পর রী ফিরে তাকালো বনহুরের দিকে।

বনহুর চামর দোলাতে শুরু করেছে কারণ এটাই তার কাজ।

রাজকন্যা রী চোখ তুলে তাকাতেই দৃষ্টি বিনিময় হলো বনহুরের সঙ্গে। রী সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না। বনহুরের দৃষ্টি রীকে যেন আকর্ষণ করছে।

রী স্থির থাকতে পারে না, উঠে দাঁড়ালো শয্যা ত্যাগ করে, এসে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে। তার হাত থেকে চামরখানা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো মেঝেতে, তারপর সে বনহুরের ডান হাতখানা ধরে শয্যায় এসে বসলো।

বনহুর তন্দ্রাচ্ছন্নের মত রীর পাশে বসলো। ধীরে ধীরে তার চোখের সামনে রীর মুখ মিশে গিয়ে ভেসে উঠলো মৌ-এর মুখখানা।

রী বনহুরের চিবুকটা তুলে ধরে নির্নিমেষ নয়নে তাকালো, বললো–তুমি বহু দিন পূর্বে আমাকে ছেড়ে একবার পালিয়ে ছিলে। এবার আর তুমি পালাতে পারবে না।

বনহুরের কানে মৌ-এর কণ্ঠ ভেসে উঠলো। আনমনা হয়ে গেলো বনহুর।

রী বনহুরের কণ্ঠবেষ্টন করে বললো–তুমি কি ভাবছে প্রিয়?

বনহুর এ শব্দগুলো মানে বোঝে না তাই সে বুঝতে পারলো না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো রীর মুখের দিকে। বনহুর ভাল করে খেয়াল করলো এই তরুণী মৌ নয়, এ হলো রী। রীর প্রতি বনহুরের মন ঘৃণায় ভরে উঠলো, কারণ মৌ–কে রী হত্যা করেছে। একটি নিষ্পাপ ফুলের মত জীবনকে চিরতরে বিলীন করে দিয়েছে। পৃথিবীর মানুষের মনে আছে হিংসা বিদ্বেষ ঈর্ষা। মঙ্গল গ্রহের মানুষের

মনেও প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে তাহলে। প্রেম–প্রীতি ভালবাসা যখন রয়েছে তখন হিংসা–বিদ্বেষও থাকবেই।

সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে বনহুর, রী তখনও বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে রয়েছে। ধীরে ধীরে রীর মুখখানা নেমে এলো বনহুরের ওষ্ঠদ্বয়ের উপর।

বনহুর ওকে বাধা দিলো না।

রী মঙ্গল গ্রহের মানুষ। তার আচরণ এবং কার্যকলাপ সব অন্যরূপ। মোমের মত নরম তুলতুলে বাহুদ্বয়। ওর ওষ্ঠ দুটি যখন বনহুরের ওষ্ঠ স্পর্শ করলো তখন বনহুর নিজের ওষ্ঠদ্বয়ে অদ্ভুত এক অনুভূতি অনুভব করলো।

বনহুর নিজের মধ্যে ভীষণ একটা উন্মাদনা অনুভব করলেও সে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে নিজকে সংযত করে রাখলো। ধীরে ধীরে বনহুর বীর বাহুবন্ধন মুক্ত করে নিয়ে ওদিকে মুক্ত জানালা দিয়ে রূপালী সূর্যের দিকে আংগুল বাড়িয়ে দেখালো।

রী কি যেন ভাবলো, তারপর আবার সে বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরতে গেলো। বনহুর রীর হাত দুখানা ধরে নামিয়ে দিলো, তারপর ওর হাত ধরে মুক্ত জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো। বনহুর কিছু বলবে বলে রীর মুখে দৃষ্টি তুলে ধরলো। কিন্তু যা সে বলতে চায় সে কথাগুলোর একটি বর্ণও রী বুঝবে না। তাই বনহুর আংগুল দিয়ে আকাশটা দেখালো।

রী হেসে মাথা রাখলো বনহুরের বুকে।

কিছু বললো রী।

বনহুর বুঝলো না কিছুই কিন্তু সে অনুমান করলো রী তাকে কিছু বলছে। হয়তো বা বলছে তোমাকে আমি ভালবাসি তোমাকে আমি স্বামীরূপে পেতে চাই....তোমার মধ্যে আমি হারিয়ে যেরেত চাই বন্ধু...নয়তো বলছে তুমি আর কোনোদিন আমার কাছ থেকে যেতে পারবে না...আমি মৌ–কে হত্যা করে তোমাকে জয় করেছি তুমি আর পালাতে পারবে না। একবার পালিয়েছিলে আমার বাসরঘর থেকে হয়তো বা বলছ তুমি ছাড়া আমি কাউকে চাই না..ঐ নীল আকাশে রূপালী সূর্যের চেয়েও তুমি আমার কাছে প্রিয়...

বনহুর আপন মনেই ভাবলো, ওর কথাগুলো এই ধরনের হতে পারে। সে ফিরে এলো মুক্ত জানালা থেকে, রীকে ধরে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে চামরখানা তুলে নিলো হাতে। ধীরে ধীরে চামরখানা দোলাতে লাগলো।

রী রাগতভাবে উঠে দাঁড়ালো।

সে বনহুরের হাত থেকে চামরখানা নিয়ে ফেলে দিলো মেঝেতে, তারপর বনহুরের হাত ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে টেবিল থেকে তুলে নিলো একটি মুকুট। এ মুকুট রীর নিজের মাথার, সেটা নিয়ে সে পরিয়ে দিলো বনহুরের মাথায়।

বনহুর হেসে নিজের বুকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে তারপর রীর বুকে আংগুল দিয়ে দেখালো, তারপর সে বললো–আমি তোমার যোগ্য নই। বুঝলে রী!

রী কিছু বুঝলো না।

সে শুধু তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে।

রী একটি শব্দ করলো, সঙ্গে সঙ্গে দুজন তরুণী একটা রেকাবিতে একটি বোতল ধরনের বস্তু ও দুইটি পানপাত্র নিয়ে হাজির হলো, বোতল ধরনের বস্তুটির মধ্যে ফিকে রঙের কোনো পানীয় ছিলো।

তরুণীদ্বয় রেকাবিসহ বোতল ও পানপত্র দুটি রেখে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর তাকিয়ে ছিলো।

রী বোতল থেকে তরল পদার্থ পানপাত্র দুটিতে ঢেলে একটি পানপাত্র বনহুরের দিকে বাড়িয়ে ধরলো, অপরটি নিজে তুলে নিলো হাতে।

বনহুর তরল পদার্থপূর্ণ পানপাত্রটি নিজের নাকের কাছে ধরে গন্ধ পরীক্ষা করে দেখলো। ফুলের সৌরভ বেরিয়ে আসছে পান পাত্র থেকে।

বনহুর যখন নাকে নিয়ে গন্ধ পরীক্ষা করছিলো তখন রী পান পাত্র থেকে তরল পদার্থটুকু এক নিঃশ্বাসে পান করে ফেললো।

পুনরায় রী তার নিজ পানপাত্র পূর্ণ করে আবার পান করলো। এবার সে পানপাত্রটি রেখে এগিয়ে এলো শয্যার পাশে। বনহুর তার হাতের পানপাত্রটি রীর দিকে এগিয়ে ধরলো। রী হাস্যোজ্জ্বল মুখে, ঢুলু ঢুলু চোখে পানপাত্রটি নিয়ে এক নিঃশ্বাসে পান করলো। তারপর শূন্য পাত্রটি বনহুরের হাতে দিয়ে শুয়ে পড়লো তার কোলের উপর।

ধীরে ধীরে চোখ দুটো মুদে আসছে রীর। বনহুরের মানসপটে রীর মুখ মুছে গিয়ে ভেসে উঠলো সেই একখানি মুখ–মৌ এর। রী মুছে গিয়ে মৌ-এর প্রতিচ্ছবি বনহুর দেখলো। রীর কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিলো সে অতি যত্ন সহকারে। বনহুরের ওষ্ঠদ্বয় এগিয়ে আসছে রীর মুখের দিকে, রীর ওষ্ঠদ্বয়ের কাছে বনহুরের মুখখানা নেমে গেলো, হঠাৎ কেউ যেন তার কানের কাছে বললো–একি করছো বনহুর, তুমি কি নিজকে হারিয়ে ফেললে হারিয়ে ফেললে তোমার সত্তাকে ... বনহুর ফিরে তাকালো পাশের দেয়ালের দিকে। ওকি, দেয়ালটা যে কথা বলছে হঠাৎ হেসে উঠলো দেয়ালটা ভীষণ শব্দ করে, সে হাসি যেন থামতে চায় না। বললো এবার দেয়ালটা–বনহুর, তুমি না অন্যদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা তুমি না লোভ–মোহ–লালসাহীন এক কঠিন পুরুষ....শত বিপদেও তুমি যেমন বিচলিত হও না, যেমন অতি মূল্যবান সামগ্রীও তোমাকে আকৃষ্ট করতে পারে না.. তেমনি কোনো নারী আজও তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারেনি...অথচ তুমি আজ...

বনহুর ফিরে তাকালো রীর মুখের দিকে।

দুচোখ মুদিত, গোলাপ পাপড়ির মত ওষ্ঠদ্বয়। রেশমের মত একরাশ চুল ছড়িয়ে আছে। ললাটে, কাঁধে, কিছুটা বনহুরের হাতের উপরেও ছড়িয়ে পড়েছে।

বনহুর নির্বাক দৃষ্টি মেলে দেখছিলো রীর মুখখানা। সত্য অপূর্ব সে রূপরাশি, বনহুর বিমুগ্ধ হয়ে যায়। ঠিক ঐ মুহূর্তে মৌ এসে দাঁড়ায় তার পাশে। বনহুর হতবাক হয়ে যায়, মৌ বনহুরকে ইশরায় ডাকে। বনহুর রীর সংজ্ঞাহীন দেহটাকে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। মৌ এগিয়ে চলতে থাকে।

বনহুর তাকে অনুসরণ করে।

বেরিয়ে আসে বনহুর।

মৌ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

বনহুর এগিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ পিছু ডাকলো কেউ।

বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, পিছু তাকাতেই সে দেখলো দিপালী দাঁড়িয়ে আছে। হাতে তার কিছু রয়েছে। ওর ডাক শুনে বনহুরের সম্বিৎ ফিরে এসেছিলো, হারিয়ে গিয়েছিলো মৌ।

দিপালী এসে দাঁড়ায় পাশে।

চাপাকণ্ঠে বলে–রাজকুমার, এক মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না, আপনার জামাকাপড় নিয়ে এসেছি, চলুন আমরা রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যাই।

হাঁ, তাই চলো। তাই চলো দিপালী…

বনহুর দিপালীর হাত থেকে জামাকাপড় নিলো, তারপর পরে নিলো সে একটু আড়ালে গিয়ে। এ পরিচ্ছদ তার নিজের।

মৌ-এর রক্তমাখা পরিচ্ছদ খুলে ফেলে হাফ ছেড়ে বাঁচলো যেন বনহুর। তার নিজের ড্রেসে তাকে বড় সুন্দর লাগছে যদিও শার্ট-প্যান্ট কিছুটা মলিন হয়ে পড়েছিলো। প্যান্টের পকেটে তার কিছু ক্ষুদে যন্ত্রপাতি ছিলো বা আছে যার দ্বারা সে অনেক অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হয়। বনহুর গোপন পকেট হাতড়ে দেখে নিলো তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো ঠিকমত আছে কি না। হাঁ, সব জিনিস যা তার প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজন সব ঠিকমতই রয়েছে। তার পকেটের ক্ষুদে যন্ত্রপাতিগুলো ক্ষুদ্র হলেও অত্যন্ত শক্তিশালী ও মারাত্মক এবং কঠিন কঠিন কাজ এসব যন্ত্র দ্বারা সমাধা করে থাকে সে।

নিজ পোশাক পরে অনেকটা স্বস্তি অনুভব করে বনহুর।

জুতো তার পায়েই পরা ছিলো।

এবার দিপালী আর বনহুর দ্রুত এগিয়ে চললো। আড়ালে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বনহুর আর দিপালী বহুদূরে সরে এলো।

রাজপ্রাসাদের বাগানবাড়িতে রাজকন্যা রী তখন ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে। বনহুরের মনে পড়লো রীর কথা কিন্তু বেশিক্ষণ রী বা কাউকে নিয়ে ভাবার সময় নেই।

বনহুর দিপালীসহ দ্রুত এগিয়ে চলল।

ঐ স্থান অভিমুখে, যে স্থানে ভূগর্ভে রয়েছে অদ্ভুত মেশিন আর বিস্ময়কর যানগুলো।

পথ ধরে এগুচ্ছে।

কোথাও সমতল, কোথাও বা টিলা, কোথাও ঝাউ আর ঝোঁপ কতকটা ভূপৃষ্ঠের মত। নদ নদী আর নালা সবও আছে কিন্তু সব সুন্দর মনোরম। চারপাশে ছড়ানো অসংখ্য মূল্যবান পাথর।

আজ দিপালীর পাথর কুড়ানোর নেশা নেই। সর্বক্ষণ তার মনে পৃথিবীতে ফিরে যাবার বাসনা তাকে উদ্রান্ত করে তুলেছে।

বনহুর আর দিপালী মঙ্গল গ্রহের হাল্কা হাওয়ায় গা ভাসিয়ে ভাসিয়ে লম্বা পা ফেলে এক সময় পৌঁছে গেলো সেই স্থানে যেখানে তারা একটা ফাটলের মধ্য থেকে আলোকরশ্মি বের হতে দেখেছিলো।

পথ চিনে আসতে তাদের ভুল হয়নি।

দিপালী খুব হাঁপিয়ে পড়েছিলো, কারণ সে এত বেশি হাঁটেনি কোনোদিন। বিশ্রামহীনভাবেই তারা হাঁটছিলো এতক্ষণ, মাঝে মাঝে বনহুর দিপালীর হাত ধরে নিয়ে চলছিলো। তবুও যদি দিপালী ঠিকভাবে চলতে পারে, এটাই হলো বনহুরের উদ্দেশ্য।

দিপালী নিজকে বড় সৌভাগ্যবতী বলে মনে করছিলো। রাজকুমার তার হাতে হাত রেখে এগুচ্ছে। পরম এক আনন্দে আত্মহারা দিপালী।

বেশ ক্ষুধা বোধ করছিলো সে।

বনহুর বুঝতে পারে, কারণ সে নিজেও অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলো।

এগিয়ে গেলো বনহুর, ওদিকে একটা ফলের বাগান। বনহুর বেশ কয়েকটা ফল পেড়ে নিয়ে হাজির হলো দিপালীর কাছে কিন্তু দিপালী কোথায়? তাকে তো দেখতে পাচ্ছে না বনহুর। হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গেলো দূরে একটি পাহাড়ের মত উঁচু জায়গার পাশে।

দিপালীকে দুজন তোক ধরে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। একজন দিপালীর মুখে হাতচাপা দিয়ে পেছনে হাত দুখানা ধরে রেখেছে, অপরজন টেনে–হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বনহুর ভালভাবে লক্ষ্য করতেই দেখলো পাহাড়টার পাশে একটা আড়ালে ত্রিকোণ একটি যান। যানটি হতে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

বনহুর হাতের ফলগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলো, তারপর সে ঐ যানটির দিকে ছুটলো। তবে পাহাড়টির আড়ালে আত্মগোপন করে ছুটতে লাগলো যেন কেউ তাকে দেখে না ফেলে।

বনহুর বের করে নিলো তার চোরাপকেট থেকে ক্ষুদে পিস্তলখানা। তারপর ঐ সে উপস্থিত হলো যানটার পাশে।

ততক্ষণে লোক দুজন দিপালীকে নিয়ে যানটির ভিতরে প্রবেশ করেছে।

বনহুর পিস্তল উদ্যত করে যানটির মধ্যে প্রবেশ করে পিস্তল চেপে ধরলো লোক দুজনের মধ্যে একজনের বুকে।

দিপালী অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো রাজকুমার

দিপালী, তুমি ওদের বুঝিয়ে বলো তোমরা আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছে দাও, নইলে যে অস্ত্র দেখছো তা অতি মারাত্মক। ঐ অস্ত্র দ্বারা তোমাদের জীবননাশ করা হবে।

দিপালী মঙ্গল গ্রহের ভাষা এক রকম প্রায় শিখেই নিয়েছিলো তাই সে বনহুরের কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করে শোনালো লোক দুজনকে।

ওরা বনহুরকে দেখে ভয় পেয়েছিলো, কারণ তার হাতের ক্ষুদে পিস্তলখানা যে এক মারাত্মক অস্ত্র এটা তারা বুঝতে পেরেছিলো এবং সে কারণে দিপালীকে

মুক্ত করে দিয়েছিলো ওরা সেই মুহূর্তে।

বনহুর কিন্তু তখনও হাতের পিস্তলখানা এক জনের বুক লক্ষ্য করে ধরে রেখেছে। বললো বনহুর–দিপালী, এরা আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছে না দিলে আমরা এদের হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করবো না। বলো দিপালী, নইলে আমাদের পৃথিবীতে ফিরে যাবার কোনো উপায় নেই বা সম্ভবও হবে না কোনোদিন।

দিপালী ঠিকভাবে কথাগুলো ওদের বুঝিয়ে বললো।

ওরা দিপালীকে পাকড়াও করে পৃথিবীতে নিয়ে যাবার জন্যই উঠিয়ে নিয়েছিলো যানটির মধ্যে। উদ্দেশ্য দিপালী পৃথিবীর মানুষের মত দেখতে, তাই তারা মঙ্গল গ্রহ থেকে সরিয়ে ফেলতে চায় ওকে।

দিপালী যখন কথাগুলো ওদের ভাষায় ওদের জানালো তখন ওরা কতকটা আশ্বস্ত হলো। দিপালীর দিকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে ওদের ভাষায় বললো বেশ, আমরা রাজি। তা ছাড়া আমরা পৃথিবীতে যাচ্ছি তোমার সঙ্গের লোকটাকে ক্ষুদে মারাত্মক অস্ত্রটা সরিয়ে নিতে বলল।

ওদের কথাগুলো দিপালী বুঝলো এবং সে বনহুরকে বললো রাজকুমার, আমরা নিশ্চিন্ত–পৃথিবীতে এরা যাচ্ছে এবং আমাদের নামিয়ে দিয়ে আসবে বলে স্বীকার করছে।

অনেক ধন্যবাদ আমি পিস্তল নামিয়ে নিচ্ছি। বনহুর কথাটা বলে পিস্তলখানাকে হাতের মুঠায় চেপে ধরে নামিয়ে রাখলে নিচের দিকে।

ওরা দুজন অদ্ভুত পোশাক পরে নিলো। অপর জন বন্ধ করে দিলো যানটির দরজা। আরও দুটো পোশাক বের করে বনহুর আর দিপালীকে পরে নেওয়ার জন্য ইংগিত করলো।

দিপালী নিজ পোশাকের উপরে ওদের দেওয়া অদ্ভুত পোশাক পরে নিলো।

বনহুর পরে নিলো সেই আশ্চর্য ধরনের পোশাক।

চালকদ্বয়ের পাশে আরও দুটো আসন ছিলো। মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিকদ্বয় বনহুর আর দিপালীকে সেই আসনে বসতে ইংগিত করলো।

বসলো বনহুর আর দিপালী।

যানটির মধ্যে অক্সিজেন ভরা ছিলো, কাজেই নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো না।

লোক দুজন যে বৈজ্ঞানিক এটা বনহুর তাদের কার্যকলাপেই বুঝতে পেরেছিলো।

মানুষের মতই এরাও নানাধরনের রাসায়নিক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। মঙ্গল গ্রহেও মানুষ কাজ করে যাচ্ছে, নানা ধরনের চাষাবাদ করে, ইমারত গড়ে। যানবাহন তৈরিতেও এরা কম পারদর্শী নয়। পৃথিবীর মানুষের মতই এরা বুদ্ধি রাখে...একদিন মঙ্গল গ্রহের মানুষ আর পৃথিবীর মানুষের মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ গড়ে উঠবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রচন্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে যানটি উপরে উঠতে লাগলো। তারপর উল্কাবেগে ছুটে চললো একদিক লক্ষ্য করে। বনহুর আর দিপালী শরীরে বেল্ট বেঁধে নিয়েছিলো। যানটির বসবার আসনের সঙ্গে সদৃঢ় বেল্ট ছিলো, কাজেই বনহুর দিপালীর শরীর বেল্ট দিয়ে বেঁধে নিজেও বেঁধে নিয়েছিলো মজবুত করে।

যানটি এত দ্রুত চলছিলো যে বাইরে সৌর জগৎটাকে শুধু ধুম্ররাশি ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছিলো না। তারাগুলো এক একটা ধুমকেতুর মত তীরবেগে ছুটে চলে যাচ্ছে। যানটির সম্মুখ এবং দুপাশে কিছু অংশ কাঁচের মত সচ্ছ বস্তু দিয়ে তৈরি বলে মনে হলো। সেইদিকে তাকিয়ে সব দেখতে পাচ্ছিলো বনহুর ও দিপালী।

কতক্ষণ কেটে গেলো।

বনহুর আর দিপালীর চিন্তাধারা একভাবে প্রবাহিত হচ্ছিলো। ওরা ভাবছে যে কোনো উপায়ে পৃথিবীর বুকে ফিরে যাওয়াটাই সবচেয়ে বড় কাজ, বড় কৃতিত্ব। বনহুরের কণ্ঠে মঙ্গল গ্রহের মহারাজের দেওয়া উপহার মহামূল্যবান হীরক–হারখানা দীপ্ত–উজ্জ্বল আলোচ্ছটা বিচ্ছুরিত করছিলো।

এ মুহূর্তে অবশ্য বনহুরের কণ্ঠের হীরকহার বা মূল্যবান পাথরটা নজরে পড়ছিলো না। যানটির মধ্যে যে অদ্ভুত পোশাক পরে নিয়েছিলো তার জন্য বনহুরের দেহটা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েছিলো। শুধু চোখ দুটো এবং ললাটের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছিলো মাত্র।

মাঝে মাঝে চালক দুজন কিছু কথা বলছিলো যদিও বনহুর বুঝতে পারছিলো না তাদের কথাগুলো তবু অনুমান করছিলো তারা তাদের নিয়ে কিছু বলছে।

সাঁ সাঁ করে একটা শব্দ হচ্ছে।

কেমন যেন একটা শব্দ।

বনহুর দিপালীর দিকে তাকিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করলো কিন্তু শব্দটা এত বেশি হচ্ছিলো যে বনহুর বলতে চাইলেও বলা হলো না। ধীরে ধীরে দুচোখ বন্ধ হয়ে আসছে বনহুর আর দিপালীর।

একটা ধুম্ররাশি সমস্ত যানটার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। বনহুর বুঝতে পারে তাদের দুজনের সংজ্ঞা লুপ্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

তারপর কখন বনহুর আর দিপালী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে তারা নিজেরাই বুঝতে পারে না।

*

দস্যুরাণী আর চন্দনা আনমনে এগুচ্ছিলো। কথা হচ্ছিলো রাণী আর চন্দার মধ্যে।

তারা রায়হান নগরী থেকে জম্বুর পর্বত অভিমুখে যাচ্ছিলো। হঠাৎ চন্দনা চিৎকার করে উঠলো–রাণী রাণী, ঐ দেখো।

দস্যুরাণী চন্দনার কথামত উপরের দিকে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠে বললো–আশ্চর্য আলোর ছটা।

শুধু আলো নয়, একটি যান বা ঐ ধরনের বস্তু। দেখো রাণী, বস্তুটা ধীরে ধীরে নেমে আসছে নিচের দিকে।

হাঁ, তাই মনে হচ্ছে। আয় চন্দনা, আমরা ঐ ঝোঁপটার মধ্যে আত্মগোপন করি।

তাই ভালো।

আমরা দেখবো ওটা কি।

অদ্ভুত বস্তু বা কোনো যান হবে।

ওর মধ্যে কি আছে দেখতে হবে চন্দনা।

দস্যুরাণী আর চন্দনা তাদের অশ্বসহ একটি বড় ঝোঁপের মধ্যে আত্মগোপন করে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। প্রায় জঙ্গলের উপর নেমে এসেছে আলোর বন্যাটা।

একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দস্যুরাণী নিজের ঠোঁটের উপর আংগুল চাপা দিয়ে চন্দনাকে ইশারা করলো– চুপ!

চন্দনার দুচোখে বিস্ময়, একটা অদ্ভুত যান নেমে এলো জঙ্গলটার মাথার উপর। একটা ফাঁকা জায়গায় যানটি নেমে দাঁড়িয়ে পড়লো।

দস্যুরাণী তার প্যান্টের পকেট থেকে ছোট্ট দূরবীনখানা বের করে চোখে লাগিয়ে দেখতে লাগলো।

চন্দনাও দেখছে।

যানটি থেমে গেলো নিশ্চুপ হয়ে।

দস্যুরাণী আর চন্দনা অবাক হয়ে দেখছে যানটি নিশ্চুপ হয়ে থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা দরজা আকার ঢাকনা খুলে গেলো।

দুজন অদ্ভুত পোশাকপরা লোক একটা লোককে বহন করে যান থেকে নামিয়ে আনলো এবং তাকে মাটিতে শুইয়ে দিলো। তারপর পুনরায় ওরা যানটার মধ্যে প্রবেশ করলো, কিছুক্ষণ পর আবার একটা লোককে ওরা দুজন বহন করে নামিয়ে আনলো যান থেকে। দ্বিতীয় লোকটাকে শুইয়ে দিলো প্রথম লোকটার পাশে। যে লোক দুটিকে ওরা যান বা ঐ অদ্ভুত বাহন থেকে নামিয়ে আনলো তারা নিশ্চয়ই প্রাণহীন অথবা সংজ্ঞাহীন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দস্যুরাণী আর চন্দনা বিস্ময় নিয়ে দেখছে।

দে লোক দুজন দুটি সংজ্ঞাহীন লোককে জঙ্গলে নামিয়ে দিলো তারা এবার যানে আরোহণ করে দরজা বন্ধ করে দিলো।

যানটি যখন ফাঁকা জায়গায় অবতরণ করে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে পড়েছিলো তখন উজ্জ্বল আলোকরশ্মিটি নিভে গিয়েছিলো। এবার ওরা যখন যানটিতে আরোহণ করলো তখন পুনরায় আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হলো যানটির চারপাশের ছিদ্রপথে।

যানটি শব্দ করে উড়ে উঠল আকাশে।

তাকিয়ে আছে দস্যুরাণী আর চন্দনা, তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছে। যানটি আকাশে ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

একটা ক্ষীণ আলোকরশি মিশে গেলো আকাশের অন্তরালে। ওরা কারা, কি উদ্দেশ্যে এসেছিলো, যে লোক দুজনকে ওরা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রেখে গেলো তারাই বা কে? মৃত না জীবিত তাই বা কে জানে।

এবার দস্যুরাণী–বললো, চল চন্দনা দেখি ওরা কারা? জীবিত না মৃত দেখা যাক।

চন্দনা আর দস্যুরাণী অশ্বপৃষ্ঠে এগিয়ে চললো। তারা সংজ্ঞাহীন লোক দুটি থেকে অনেক দূরে ছিলো, এবার তারা এগিয়ে চললো জঙ্গলের মধ্যে।

তারপর অশ্বপৃষ্ঠ হতে নেমে দস্যুরাণী আর চন্দনা সংজ্ঞাহীন লোক দুটির দিকে এগিয়ে চললো। যতই নিকটবর্তী হচ্ছে ততই আশ্চর্য হচ্ছে দস্যুরাণী আর চন্দনা। জমকালো আচ্ছাদনে সমস্ত দেহ আচ্ছাদিত, এমনকি মুখমন্ডল তাদের কভারে ঢাকা রয়েছে। ওরা কারা কিছু বুঝতে পারে না।

দস্যুরাণী আর চন্দনা একেবারে ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। দস্যুরাণী হাঁটু গেড়ে বসে একজনের মুখের আবরণ খুলে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য হলো দস্যুরাণী আর চন্দনা।

চন্দনা বলে উঠলো–নারী!

হ চন্দনা, তাই তো দেখছি। অপর ব্যক্তিটি আকারে বড়–নিশ্চয়ই পুরুষ হবে, বললো দস্যুরাণী।

এবার দস্যুরাণী অপর ব্যক্তির মুখের আবরণ খুলে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট শব্দ করে উঠলো–একি, এ যে বনহুর!

বনহুর!

হ বনহুর, কিন্তু এভাবে এখানে যানটির মধ্যে এলো কি করে সে। তাছাড়া অজ্ঞান অবস্থায়।

রাণী, এ বনহুর নাও হতে পারে। তারই মত হয়তো দেখতে।

না, অন্য কেউ নয়–এ দস্যু বনহুর। আমি তাকে ভালভাবে চিনি।

তাহলে এ লোকটাই বনহুর। আমারও মনে পড়ছে চেহারাটা কিন্তু সে কি করে ঐ যানটির মধ্যে গেলো?

কিছুই আশ্চর্য নয় চন্দনা। এ পৃথিবীতে সবই সত্য এবং বাস্তব কারণ যে যানটি দুজনকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নামিয়ে রেখে গেলো ঐ যানটি পৃথিবীর মানুষের তৈরি নয়....

তাহলে কি তুমি চলতে চাও ওটা আকাশ থেকেই নেমে এসেছিলো, আবার আকাশে চলে গেলো?

হাঁ, আমার তাই মনে হয়। বললো দস্যুরাণী।

চন্দনা বললো–তাহলে বনহুর কি আকাশে গিয়েছিলো বলতে চাও রাণী?

অসাধ্য কিছু নেই তার।

যেমন তুমি, তাই না রাণী?

যদি মনে করো তাই! যাক ওসব কথা, শোনো চন্দনা!

বলো?

এদের দুজনকে কি করা যায় বলো? নিশ্চয় গভীর কোনো রহস্য রয়েছে এদের পেছনে। তাছাড়া এ মেয়েটি কে? বনহুরের সঙ্গে নিশ্চয়ই এর কোনো সম্বন্ধ আছে।

শুনেছিলাম দস্যু বনহুর নাকি বিবাহিত।

হাঁ, এ কথা সত্য। কিন্তু এই মহিলা দস্যু বনহুরের স্ত্রী নয় এটা আমি বেশ উপলব্ধি করছি তবে ধারণা মাত্র

চন্দনা বললো–যাই হক আগে এদের সেবাযত্নের প্রয়োজন আছে।

কিন্তু এখানে এভাবে তত এদের কোনো সেবাযত্র চলে না। চন্দনা, তুই আমাকে সাহায্য কর, আমি বনহুরকে আমার রুহীর পিঠে তুলে নিই আর মেয়েটিকে দুকীর পিঠে…

চমৎকার বলেছো রাণী দস্যু বনহুরকে আমার বড় ভয়……

কারণ? ও, বুঝেছি হঠাৎ যদি ওর নজরটা তোর উপর গিয়ে পড়ে, তাই তো?

যাও রাণী তুমি বড় ইয়ে।

যা বলিস চন্দনা, দিন দিন তোর রূপ আমাকেই মুগ্ধ অভিভূত করছে।

ভাগ্যিস তুমি পুরুষ নও তাই রক্ষা

সে কথা মিথ্যে নয়। পুরুষ হলে তোকে আমি…যাক ও সব কথা, নে ধর দেখি। বনহুর আর দিপালীকে রাণী আর চন্দনা নিজ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিলো।

রাণী বনহুরের পাশে বসলো।

চন্দনা বসলো দিপালীর পাশে।

দস্যুরাণী আর চন্দনা নিজ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসতেই অশ্বদ্বয় তীরবেগে ছুটতে শুরু করলো।

বন-জঙ্গল পেরিয়ে জম্বু পর্বত অতিক্রম করে হীরামতি পর্বতে নিজ আস্তানায় এসে পৌঁছলো দস্যুরাণী আর চন্দনা।

সঙ্গে সঙ্গে রহমত ও আরও কয়েকজন অনুচর এসে দাঁড়ালো দস্যুরাণী আর চার পাশে।

রাণী এবং চন্দনার অশ্বপৃষ্ঠে দুটি সংজ্ঞাহীন অদ্ভুত পোশাকপরা মানুষকে দেখে তারা কম আশ্চর্য হলো না। কিন্তু কেউ কিছু বলার বা জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না।

দস্যুরাণী আর চন্দনা বনহুরের পরিচয় ওদের কাছে এ মুহূর্তে দিলো না।

অনুচরগণ রাণীর নির্দেশমত কাজ করলো। তারা সংজ্ঞাহীন ব্যক্তিদ্বয়কে নামিয়ে নিয়ে গেলো। জম্মুর পর্বতে দুটি ভিন্ন গুহায় ওদের যত্ন সহকারে রাখা হলো।

রাণী বললো–চন্দনা, তুই বনহুরের পাশে থাকবি কারণ ওর গলায় যে উজ্জ্বল পাথরযুক্ত হার রয়েছে তা অতি মূল্যবান তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হাঁ রাণী সে কথা সত্য, আমি কখনও এমন পাথর দেখিনি।

চন্দনা, ঐ পাথর আমাদের পৃথিবীর নয়, নিশ্চয় কোনো বিস্ময়কর পাথর ওটা। তা ছাড়া যে যানটি বনহুর ও তার সঙ্গিনীটিকে পৃথিবীর বুকে রেখে গেলো, সে যানটিও সাধারণ নয়……,

আমারও তাই সন্দেহ হচ্ছে।

যাক, ওর সংজ্ঞা ফিরে এলেই সব জানা যাবে। চন্দনা, তুই ওর পাশে থাকবি, আর মেয়েটার পাশে থাকবে নাসিমা।

নাসিমা রাণীর সেবিকা, বয়স তার চল্লিশ হবে তবু সে বড় কর্মঠ এবং যতুপরায়ণ। নাসিমাকে বনহুরের সঙ্গিনীটির সেবা যত্বের দায়িত্বভার দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলো রাণী।

চন্দনা বললো–ঠিক আছে! কিন্তু বনহুরের সংজ্ঞা ফিরে এলে তখন কি বলব?

যা সে প্রশ্ন করবে তার জবাব দিবি।

রাণী, বনহুরকে আস্তানায় এনে ভাল করোনি কিন্তু....

সে আমি দেখবো। তুই বনহুরের গুহায় যা, আমি চললাম।

কোথায় যাবে? এই তো এলে, বিশ্রাম করবে না একটু?

এখন বিশ্রামের সময় নেই।

রাণী!

বল চন্দনা?

তুমি একদিন বনহুকে বন্দী করেছিলে আর আজ তাকে হাতের মুঠায় পেয়েও....

চন্দনার কথায় একটু হেসে বললো রাণী–হ, সে কথা সত্য, বনহুরকে আমি একদিন আটক করেছিলাম।

আজ তাকে হাতের মুঠায় পেয়েছে।

তবু আমি ওকে আটক করবো না।

কারণ?

কারণ পরে জানাবো।

রাণী, কত কথাই না তুমি জানাবে বলে আর জানাওনি।

ততক্ষণে রাণী হেসে বেরিয়ে গেছে।

চন্দনা এসে দাঁড়ালো বনহুরের সংজ্ঞাহীন দেহটার পাশে। অদ্ভুত পোশাক পরিহিত বলিষ্ঠ একটি পুরুষ। সমস্ত দেহটা তার বিস্ময়কর পোশাকে আবৃত থাকলেও মুখখানা অনাবৃত ছিলো। বনহুরকে একবার তারা বন্দী করতে সক্ষম হয়েছিলো কিন্তু আটক করে রাখতে পারেনি। আজ যেমন করে চন্দনা ওকে

দেখছে তেমন করে দেখবার সুযোগ আসেনি তার জীবনে। চন্দনা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়, তাকায় সে নির্ণিমেষ নয়নে। দস্যু বনহুর নাম সে শুনেছিলো, তার প্রচন্ড প্রতাপ সম্বন্ধেও চন্দনা জানে, বন্দী করার পর ভীষণ একটা আগ্রহ নিয়ে সেদিন চন্দনা রাণীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো একটা অহেতুক কথা নিয়ে, উদ্দেশ্য দস্যু বনহুরকে দেখা। চন্দনা ভেবে চলেছে, এই বনহুর নামে সমস্ত কান্দাই প্রকম্পিত…না, না চন্দনা, শুধু কান্দাই না, সমস্ত পৃথিবী দস্যু বনহুর নামে প্রকম্পিত চন্দনা…কথাটা একদিন বলেছিলো রাণী। আজও সেই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পায় চন্দনা। বনহুর সাধারণ দস্যু নয়, তার দস্যুতা বিস্ময়কর বটে–যেমন দস্যুরাণী। দস্যুতা তার যেমন পেশা নয় নেশা–তেমনি দস্যু বনহুরের। বনহুর সম্বন্ধে চন্দনার মনে অনেক প্রশ্ন জমা রয়েছে। অনেকের মুখে সে শুনেছে বনহুর সম্বন্ধে অনেক কথা যা তাকে বিস্মিত হতবাক করেছে, করেছে অভিভূত। আজ সেই দস্যু বনহুর তার সামনে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শায়িত।

চন্দনা তাকালো গুহার দরজার দিকে।

এলোমলো ভাবনাগুলো মাকড়সার জালের মত জড়িয়ে পড়েছে চন্দনার মনের আকাশে। তার ভাবনার যেন অন্ত নেই। অনেকে বলে বনহুর দুর্দান্ত ভয়ংকর হৃদয়হীন পিশাচ। আবার কেহ বলে বনহুরের মত হৃদয়বান ব্যক্তি আর হয় না, তার দয়ায় হাজার হাজার অসহায় মানুষ দুবেলা দুমুঠো খেয়ে–পরে বাঁচতে পারছে। আবার অনেকে বলে বনহুর নরপশু, সে যে কোনো নারীর সতীত্ব নাশ করতে দ্বিধাবোধ করে না। নারী আর মদ নাকি তার জীবন…কিন্তু রাণীর মুখে সে শুনেছে বনহুর নারীর সম্মান সবচেয়ে বেশি দেয় বা দিতে জানে। তবে বনহুরের সঙ্গিনীটি কে–তার স্ত্রী কি ঐ মেয়েটি। কিন্তু বনহুর তো স্ত্রীকে নিয়ে কখনও কোথাও যায় না শুনেছে চন্দনা, তাহলে কে ও….

স্পষ্ট একটা নিঃশ্বাসের শব্দ কানে যেতেই চন্দনা দৃষ্টি ফেরালো, একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলো সে। চোখ দুটো সংজ্ঞাহীন বনহুরের মুখেই ছিলো এতক্ষণ, অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায় দৃষ্টি তার চলে গিয়েছিলো গুহার দেয়ালে। নিঃশ্বাসের শব্দ বনহুরের। সংজ্ঞা ফিরে এসেছে তার। বনহুর চন্দনার দিকে তাকিয়ে কিছু ভাববার চেষ্টা করছে।

সহসা চন্দনা কোনো কথা বলতে পারলো না। বনহুরের চোখ দুটোর কাছে তার দৃষ্টি পরাহত

বনহুর চারদিকে তাকিয়ে ভালভাবে দেখতে লাগলো। এটা তো সৌরজগৎ নয়, গুহায় দেয়াল চিনতে তার ভুল হলো না। বনহুরের সামনে দন্ডায়মান একটি নারী। কে এই নারী–দিপালী যে নয় সে বেশ বুঝতে পারলো। ধীরে ধীরে মনে পড়লো সেই অদ্ভুত যানটির কথা মনে পড়ছে মঙ্গল গ্রহের কথা।

চন্দনা বললো–আপনি কি সুস্থ বোধ করছেন?

বনহুর তীক্ষ্ণ নজরে চন্দনাকে লক্ষ্য করে বললো–হাঁ, তবে আমি এখন কোথায় জানতে পারি কি? ভূপৃষ্ঠে না সৌরজগতে। তবে আমার মনে হয় এখন আমি ভূপৃষ্ঠে রয়েছি। বলুন জবাব দিন?

আপাতত নয়।

কারণ?

কারণ বলা আমার উপরওয়ালার বারণ আছে।

তাহলে আমি…

ঠিক বন্দী নন তবে কতকটা।

ও! একটু থেমে বললো–তা যাহোক, বলুন আমার সঙ্গিনীটি কোথায়?

মানে?

আমার সঙ্গে একজন মহিলা ছিলো না?

হ ছিলো।

সে কোথায়?

আছে।

সত্যি বলছেন আছে? ভাল আছে? জীবিত আছে?….

কেন, সন্দেহ ছিলো?

হ ছিলো, কারণ আমরা পৃথিবী ছেড়ে কোটি কোটি মাইল দূরে ছিলাম।

আপনি যা বলছেন সত্য, কারণ আপনাদের দুজনকে একটি বিস্ময়কর যান একটি জঙ্গলে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নামিয়ে দিয়ে গেছে....এর বেশি আমি কিছু বলতে পারবো না।

বেশ! বনহুর উঠে বসলো।

চন্দনা বেরিয়ে গেলো।

ও বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গুহার দরজাটা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেলো।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো।

বেশ বুঝতে পারলো সে যে স্থানে আশ্রয় পেয়েছে সে যায়গাটা সাধারণ স্থান নয়, এমন কোনো জায়গা যেখান থেকে সে সহজে বেরিয়ে যেতে পারবে না। তবে কে বা কারা তাকে যত্ন সহকারে আশ্রয় দিয়েছে, তার সেবাযত্ন করেছে কিন্তু দিপালী কোথায় নানা রকম এলোমেলো চিন্তা বনহুরের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো।

বনহুর এসে গুহার বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। গুহার মুখ প্রকান্ড একটা পাথর দিয়ে বন্ধ রয়েছে। কৌশলে বন্ধ করা হয়েছে। হাত দিয়ে বা শক্তি দ্বারা ভোলা সহজ নয়।

ভাবছে বনহুর ঠিক ঐ মুহূর্তে গুহার বাইরে ভারী বুটের শব্দ শোনা গেলো।

বনহুর ফিরে এলো তার আগের জায়গায়।

চোখ বন্ধ করে প্রতীক্ষা করতে লাগলো সে। ইতিমধ্যে তার দেহে যে মঙ্গল গ্রহের অদ্ভুত পোশাক ছিলো তা খুলে পাশে রেখেছে। বনহুর বুঝতে পেরেছিলো সেই পোশাক সহ ওরা তাদের দুজনকে রেখে গেছে পৃথিবীর বুকে। কিন্তু ওরা কি উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলো কে জানে। বনহুর নিজ গলায় মঙ্গল গ্রহের মহারাজ প্রদত্ত উপহার পাথরযুক্ত হারটা এখনও তেমনি দেখতে পাচ্ছে। এ পাথর অতি মূল্যবান, যে কোনো মুহূর্তে তার সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হারটি খুলে নিতে

পারতো কিন্তু তা নেয়নি। কে বা কারা তাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তুলে এনেছে। বিস্ময়কর মানুষ, নইলে এ হারের লোভ কেউ ত্যাগ করতে পারে না...

গুহার মুখ থেকে পাথরখন্ডটা ঘড় ঘড় শব্দ সরে গেলো একপাশে।

বনহুর চোখ ফেরালো গুহার মুখের দিকে।

আশ্চর্য হলো বনহুর, সমস্ত শরীর জমকালো পোশাকে আবৃত। প্যান্ট পরিহিত, পায়ে ভারী বুট, পিঠে রাইফেল, মুখে কালো রুমাল বাঁধা, চোখে কালো চশমা, মাথায় ক্যাপ।

বনহুরের পাশে এসে দাঁড়ালো রাণী।

হঠাৎ হেসে উঠলো খিল খিল করে।

দুচোখে বিস্ময় নিয়ে বনহুর তাকালো ঐ চোখ দুটির দিকে যে চোখ দুটি কালো চশমায় ঢাকা। ততক্ষণে হাসি থেমে গেছে, বললো রাণী–বনহুর, ভাবতে পারিনি তোমার এ করুণ অবস্থা

বনহুর বলে উঠলো–ও তুমি?

চিনতে পেরেছো তাহলে?

পরিচয় যখন একদিন ঘটেছিলো তখন চিনতে বাকি রইবে কেন। জানি তুমি ছাড়া আর কেউ।

তোমাকে আশ্রয় দিতো না।

অবশ্য সে কথা ভেবে বলিনি, আমি আমার গলার এই পাথরটার কথা ভেবে বলছি। এ পাথর যখন এখনও আমার গলায় রয়েছে তখনই আমি বুঝতে পেরেছি এমন কোনো ব্যক্তি আমাকে উদ্ধার করেছে যার হৃদয় অনেক বড়...

বনহুর!

হাঁ রাণী, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

থাক বহু বলেছে। কিন্তু এখনও তুমি আমার বন্দীশালায় আটক আছে। তুমি নিজেই এখন আমার আয়ত্তে, কাজেই তোমার কণ্ঠের মূল্যবান পাথরটি সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত যে ওটা এখন আমার।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো।

রাণীর ঠিক পেছনে চন্দনা।

বনহুর বললো–রাণী, তোমার সঙ্গে মেয়েটি সম্বন্ধে আমি কি নিশ্চিন্ত হতে পারি?

কোন্ বিষয়ে?

যে কোনো প্রশ্ন করতে পারি কি?

নিশ্চয়, তবে আমি জানি যা সমীচীন নয় এমন প্রশ্ন তুমি আমাকে করবে না।

জানি তুমি আমার কতখানি উপকার করেছে। ভাবতেও পারিনি ভাগ্য তোমাদের কাছে টেনে আনবে। ওর মুখে শুনেছি–চন্দনার দিকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো বনহুর সেই অদ্ভুত যানটি যখন পৃথিবীর বুকে নামিয়ে দিয়ে গেলো তখন তুমি আমাদের নিয়ে না এলে কোনো হিংস্র জীবজন্তুর উদরে প্রবেশ করতাম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

রাণী পুনরায় হেসে উঠলো– বনহুর তোমার জীবন রক্ষা পেলেও তুমি রক্ষা পাবে না ...

কারণ?

কারণ, তুমি আমার কারাগার থেকে পালিয়ে আমাকে জব্দ করতে চেয়েছিলে

চেয়েছিলাম, করিনি তো?

না করেছ। কিন্তু ভাগ্য তোমাকে আবার আমার কবলে টেনে এনেছে। এবার সহজে তুমি আমার হাত থেকে নিস্তার পাবে না বনহুর।

দুঃখ নেই তবে আমার সঙ্গিনীর সুসংবাদ পেলে কতকটা নিশ্চিন্ত হতাম।

দস্যুরাণী গম্ভীর কণ্ঠে বললো–সঙ্গিনীর পরিচয় জানলে খুশি হতাম।

ও আমার অনুচরদের একজন।

তাহলে যা শোনা যায় তা মিথ্যে নয়।

রাণী কি শুনেছেন তা জানলে আমি হয়তো সঠিকভাবে উত্তর দিতে চেষ্টা করতাম।

যা সত্য বলতে আমার দ্বিধা নেই। অবশ্য সবকিছু আমি বিশ্বাস করি না তবু যা শুনেছি তা সত্য কিনা জানতে চাই। দস্যু বনহুর নাকি সুন্দরী নারীদের প্রিয়পাত্র?

এটা অস্বীকার করলে মিথ্যা বলা হবে।

ও, তাহলে অনুচর হিসেবে সুন্দরীদের বেছে নেওয়াও বনহুরের স্বভাব?

দস্যুরাণীর সন্দেহ সত্য নয়! দিপালী আমার বিশ্বস্ত অনুচর ছাড়া কিছু নয়।

ওর নাম দিপালী?

হাঁ, বড় ভালো মেয়ে....যা ওর কোনো অসুবিধা না হলে খুশি হবো রাণী। আমি জানি তোমার কাছে আমাদের অবমাননা হবে না।

চন্দনা বললো–রাণী ওর কথাগুলো কিন্তু বড় হেয়ালিপূর্ণ, ওকে বেঁধে রাখা উচিত ..

ভয় নেই, আমি বেঈমানি করবো না। দীপ্তময় একটু হাসি হেসে বললো বনহুর।

রাণী কিছু না বলে নিশ্চুপ পায়চারী করতে লাগলো।

চন্দনা তাকিয়ে ছিলো দুচোখে বিস্ময় নিয়ে।

ওকে যত দেখছে তত হতবাক হচ্ছে; ওর কথাগুলো, ওর বলার ভঙ্গী, ওর বলিষ্ঠ সুন্দর পৌরুষদীপ্ত চেহারা চন্দনার সমস্ত মনকে অভিভূত করে তুলছিলো। ওর নাম সে বহু শুনেছে, ওর কার্যকলাপ নিয়ে বহু কথা তার কানে এসেছে কিন্তু এমন করে বনহুরকে দেখবে বা দেখতে পাবে। ভাবতে পারেনি চন্দনা।

হঠাৎ রাণী চন্দনাকে লক্ষ্য করে বললো–চল চন্দনা।

চন্দনা একবার রাণীর কালো রুমালে আবৃত মুখমন্ডলের দিকে তাকিয়ে বনহুরের মুখেচোখে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো, তারপর সে বললো–চলো রাণী।

চন্দনাসহ রাণী বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই বনহুর বললো–মিঃ চৌধুরী কেমন আছেন তা তো বললে না রাণী?

দস্যু বনহুরের প্রশ্নে থমকে দাঁড়ালো দস্যুরাণী, বললো–ওর কথা স্মরণ আছে তাহলে?

মিঃ চৌধুরীকে ভোলা মোটেই সম্ভব নয়। তার কথা সব সময় স্মরণ হয়।

ভাল আছেন উনি।

দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?

হয়তো হতে পারে। আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে কি?

আপাততঃ নেই, যেতে পারো কিন্তু খেয়াল রেখো রাণী আমি ক্ষুধার্ত...কথাটা বলে হাসলো। বনহুর।

ততক্ষণে গুহার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে রাণী।

সঙ্গে সঙ্গে গুহার মুখ থেকে পাথর সরে গেলো।

রাণী আর চন্দনা বেরিয়ে গেলো বাইরে।

পাথরটি পুনরায় গুহামুখ বন্ধ করে পূর্বের ন্যায় স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর বদ্ধ গুহায় বসলো স্থির হয়ে।

কয়েক মিনিট পর একটা বিরাট ট্রের উপরে স্তূপাকার ফলসহ চন্দনা ফিরে এলো।

বনহুর চোখ তুলে তাকাতেই চন্দনা বললো–নিন খেয়ে নিন।

বনহুর চন্দনার হস্তস্থিত স্তূপাকার ফলগুলোর দিকে তাকিয়ে বললো– রাণীর খেয়াল আছে আমি কি খেতে ভালবাসি। মিস্ চন্দনা, ধন্যবাদটা তাকে জানিয়ে দিবেন। কথাটা বলে বনহুর ফল সহ রেকাবিটা নিয়ে নিজের সামনে রাখলো, তারপর খেতে শুরু করলো।

চন্দনা চলে যাচ্ছিলো। বনহুর বললো–দিপালীর জ্ঞান ফিরে এসেছে কি?

হাঁ

সে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলো?

করেছিলো।

কি জবাব পেয়েছে সে?

যা সত্য তাই জানানো হয়েছে তাকে।

সাক্ষাৎ লাভের আশা করতে পারি কি?

রাণীকে জিজ্ঞাসা করে দেখবো। কথাটা বলে বেরিয়ে যায় চন্দনা।

বনহুর ফল খেতে লাগলো।

হঠাৎ কে যেন ডাকলে তার নাম ধরে, সুমিষ্ট সে কণ্ঠস্বর।

বনহুর চোখ তুললো, একিমৌ দাঁড়িয়ে তার সামনে।

বনহুর বললো–তুমি!

হ আমি...

এখানে কি করে এলে?

জানো না আমি সর্বক্ষণ তোমার সঙ্গে আছি। তুমি যখন এসেছে তখন আমিও এসেছি তোমার সঙ্গে।

সত্যি বলছো?

হ্যাঁ

তুমি পৃথিবীর মানুষের মত কথা বলতে পারো?

পারি!

কই আগে তো পারতে না?

তখন আমার বিচরণ ছিলো শুধু মঙ্গল গ্রহে আর এখন আমি সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে পারি, দেখছোনা তোমার বদ্ধ গুহায় কি করে প্রবেশ করলাম...

সত্যি আমি আশ্চর্য হয়েছি তুমি আমাদের মত কথা বলতে পারছে....

তুমি আমার! আমি তোমাকে আর হারাতে চাই না

কিন্তু...মৌ তুমি–তুমি যে মরে গেছে...

না না আমি মরিনি, আমি মরিনি...মৌ দুহাতে মুখঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বনহুর ভাল করে তাকালো।

গুহার আধো অন্ধকারে একটা দীপ্তময় আলো মৌ-এর চারপাশে ছড়িয়ে আছে, তার রেশমের মত চুলগুলো বাতাসে উড়ছে।

বনহুর অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এই বদ্ধগুহায় এত হাওয়া কোন্ দিক দিয়ে প্রবেশ করলো। তবে কি কোনো চোরাপথ আছে।

উঠে দাঁড়ালো বনহুর, মৌ-এর দিকে এগুলো।

মৌকে সে স্পর্শ করতে গেলো।

মৌ এগুলো গুহার দরজার দিকে।

বনহুর মৌকে ধরবে বলে হাত বাড়াতেই সে স্পর্শ করলে গুহার কঠিন পাথর। বিফল হয়ে ফিরে এলো বনহুর, মনটা তার জ্বালা করে উঠলো অসহ্য যন্ত্রণায়। মৌ-এর প্রতিচ্ছবি কেন তাকে বার বার বিভ্রান্ত করছে ভেবে পায় না সে।

*

হাঙ্গেরী কারাকক্ষে মাথার নিচে হাত দিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলো জাভেদ। সে ভাবতেও পারেনি এই কারাগারে তাকে আটক অবস্থায় থাকতে হবে। একদিন তার বাপুকে সে উদ্ধার করেছিলো এই হাঙ্গেরী কারাগার থেকে। সেদিন সে ছিলো বালক মাত্র। তার বাপু খুশি হয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিলো সাবাস বেটা! সেদিনের বাপুর কণ্ঠস্বর আজও তার কানের কাছে প্রতিধ্বনি জাগায়। অনেক কথাই আজ জাভেদের মনে পড়ছে, রাগে–ক্ষোভে মনটা তার ভরে উঠেছে, তাকে কি চিরদিন এই কারাগারে এভাবে কাটাতে হবে

হঠাৎ জাভেদের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। একটা আলোর ঝলকানি চোখে লাগলো

সজাগ হয়ে বসলো জাভেদ। সে দেখতে পেলো একজন রক্ষী কারাকক্ষের দিকে এগিয়ে আসছে।

রক্ষী টর্চ জ্বেলে সন্ধান করছে জাভেদের।

জাভেদ চোখ রগড়ে ডাকলো রক্ষীটিকে।

রক্ষী এগিয়ে এলো।

জাভেদ ওকে আরও কাছে ডাকলো।

রক্ষী কিছু বুঝতে না পেরে গরাদের শিকের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো।

জাভেদ তাকে কিছু বলবার জন্য গরাদের শিকের ঠিক কাছাকাছি এসে ওর কোমরের বেল্ট চেপে ধরলো বাম হাতে, আর ডান হাতে হঠাৎ টিপে ধরলো ওর কণ্ঠনালী। এত দ্রুত জাভেদ কাজ করলো যে, রক্ষী কিছু বুঝবার পূর্বেই তার কোমরের বেল্ট থেকে চাবির গোছা টেনে খুলে নিলো; তারপর রক্ষীর সংজ্ঞাহীন দেহটা ছেড়ে দিলো, সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেলো রক্ষীর দেহটা।

জাভেদ খুলে ফেললো চাবি দিয়ে লোহার দরজার কঠিন তালাটা, তারপর বেরিয়ে এলো অতি সন্তর্পণে। কিছুটা এগুতেই পুলিশ প্রহরীদের একজন দেখে ফেললো জাভেদকে।

পুলিশটি সঙ্গে সঙ্গে হুইসেল বাজালো।

অমনি অগণিত পুলিশ অস্ত্র নিয়ে ছুটে এলো চারপাশ থেকে।

কিন্তু জাভেদ তখন কোথায়?

সে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে একেবারে প্রাচীরের পাশে এসে প্রাচীর ঘেষে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

রাতের অন্ধকারে একটি থামের আড়ালে দাঁড়ালো জাভেদ।

পুলিশমহল তখন ক্ষিপ্তের মত ছুটাছুটি করছে।

এবার পুলিশ ভ্যানগুলো হাঙ্গেরী কারাগার থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য দ্রুত প্রস্তুত হয়ে নিলো। তাদের ধারণা জাভেদ হাঙ্গেরী কারাগার থেকে পালিয়েছে।

ওদিকে জাভেদ তখন প্রাচীরের পাশে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিলো। পুলিশবাহিনী যখন ভ্যানে উঠে বসছিলো তখন অন্ধকারে ভ্যানের ড্রাইভ আসনের নিচে উঠে বসলো। কেউ বুঝতে পারলো না, বন্দী তাদের ভ্যানের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে।

হাঙ্গেরী কারাগারের ফটক খুলে গেলো।

ভ্যানগুলো দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলো কারাগার প্রাঙ্গণ থেকে।

সমস্ত শহরময় ছড়িয়ে পড়লো বিপদ সংকেতধ্বনি– হাঙ্গেরী কারাগার থেকে তরুণ জংলী ডাকু পালিয়েছে। কোন পথে কেমন করে পালালো কেউ বলতে পারে না।

পুলিশ ভ্যানগুলো ছড়িয়ে পড়েছে শহরের বিভিন্ন রাস্তায়।

রাস্তার ঐফিক পুলিশ প্রাইভেট যানবাহনগুলোকে পথের পাশে থামিয়ে দিয়েছে। সন্ধান চালানো শুরু হয়েছে পথের ধারে বন্ধ দোকান পাটগুলোতে।

পথচারী দুচার জন যারা নিশাচরের মত পথ চলছিলো তারাও সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে যে যার গন্তব্যপথে দ্রুত আত্মগোপন করলো।

পুলিশ ভ্যান পথে থেমে পড়লো। ছড়িয়ে পড়লো পুলিশগণ অস্ত্র বাগিয়ে। একটা নিশাচর লোককে ফলো করে তাড়া করলো, এমনকি গুলী করলো তারা লোকটাকে লক্ষ্য করে।

তীব্র আর্তনাদ করে লোকটা পড়ে গেলো।

লোকটা ভীতভাবে একটা দোতলার বেলকুনি বেয়ে পালাতে চেষ্টা করছিলো কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস তাকে মৃত্যুবরণ করতে হলো।

লোকটি ছাদ থেকে নিচে পড়তেই পুলিশবাহিনী ছুটে গেলো লোকটার পাশে। টর্চের আলো ফেলতেই পুলিশবাহিনী অবাক হলো–এ ব্যক্তি সেই জংলী তরুণ নয়।

জংলী তরুণ জাভেদ তখন পুলিশ ভ্যান থেকে সরে পড়েছে। এবার তাকে পায়কে! জাভেদ অতি সতর্কতার সঙ্গে পুলিশদের দৃষ্টি এড়িয়ে বহুদূরে সরে পড়লো।

কান্দাই পুলিশবাহিনীর চোখে ধূলো দিয়ে সে হাঙ্গেরী কারাগার থেকে বেরিয়ে গেলো। কোনো শক্তি তাকে ধরে রাখতে সক্ষম হলো না।

*

নুর কথাটা শোনামাত্র ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সে তখনই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। সঙ্গে বাইনোকুলার, রিভলভার এবং ক্ষুদে ওয়্যারলেস।

সংবাদটা তাকে দিয়েছিলেন শংকর রাও।

মিঃ হারুনও এ ব্যাপারে সংযোগ রেখেছিলেন মিঃ রাওয়ের সঙ্গে।

মিঃ শংকর রাও নূরকে নিয়ে কঠিন কঠিন কাজ সমাধা করতে চান। তারা জানেন নূর শুধু ডিটেকটিভ নয়, সে একজন বুদ্ধিদীপ্ত বলিষ্ঠ পুরুষ। তাকে দিয়ে প্রশাসন বিভাগের অনেক কাজ করানো সম্ভব হবে।

মিঃ শংকর রাও এবং মিঃ হারুন এ ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে নানা আলাপ আলোচনা করে যাচ্ছেন। প্রশাসন নিয়ে তাদের চিন্তার অন্ত নেই, হাজার হলেও তারা পুরানো পুলিশ কর্মচারী। তারা চাকুরীতে বহাল থাকাকালীন দেশে দুস্কৃতিকারী এবং অসৎ ব্যক্তিদের দৌরাত্ম বেড়ে যাওয়া তাদের অকৃতকার্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ, তাই তারা এ ব্যাপারে সজাগ।

মিঃ শংকর রাও এবং মিঃ হারুন বেশ নাকানি চুবানি খেয়েছেন দস্যু বনহুরের কাছে। শুধু তাই নয়, বনহুরের অনুচরগণও তাদের কম পেরেশানি করেনি। এ ছাড়া রয়েছে অন্যান্য দুস্কৃতিকারী। যাদের দৌরাত্ম্য রোধ করতে হলে প্রয়োজন রয়েছে এই তরুণ ডিটেকটিভের। নুরুজ্জামান চৌধুরীকে দিয়ে তারা কৌশলে কাজ করিয়ে নিতে চান এবং নিচ্ছেনও।

কিছুদিন হলো বনহুরের সাড়াশব্দ পাচ্ছেন না তারা, তবে চোরাচালানী, অসৎ ব্যবসায়ী দুস্কৃতিকারীদের দৌরাত্ম্য ভীষণ বেড়ে গেছে।

মিঃ শংকর রাও ও মিঃ হারুন এবং কান্দাই পুলিশ কর্মকর্তাগণ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। তারা কিছুতেই কন্ট্রোল করতে পারছেন না। ছোটখাটো দুস্কৃতিকারীদের লালন পালন করছে কারা, তারা হলেন দেশের স্বনামধন্য নেতৃবর্গ। যারা সরকারের সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, মঞ্চে দাঁড়িয়ে গদগদ কণ্ঠে জনগণের মঙ্গল কামনা করে রুমালে চোখ মোছেন আর লোকচক্ষুর অন্তরালে অসহায় মানুষের হাড়ি চুষে রস খান। এরাই হলেন আজকের নেতা, দেশের দশের আশ্রয়দাতা, সরকার বাহাদুরের মেরুদন্ড।

পুলিশমহল সব বোঝেন জানেন তবু তারা এ ব্যাপারে নির্বাক। বুঝেও না বোঝার ভান করেন বা দেখেও দেখেন না, কারণ দেশের যারা হর্তকর্তা বিধাতা তাদেরতো কিছু করতে পারেন না বা বলতেও পারেন না। নুরুজ্জামান চৌধুরীরই একমাত্র তরুণ ডিটেকটিভ যে এরি মধ্যে বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ভিতরের রহস্য খুঁজে বের করেছেন তবে সায়েস্তা করা এখনও সম্ভব হয়নি।

মিঃ শংকর রাও এবং মিঃ হারুন নূরুজ্জামানের কাছ থেকে কিছু রিপোর্ট সংগ্রহ করেছেন যা অতি গোপনীয়।

রিপোর্টগুলো যখন নূরুজ্জামান চৌধুরী তাদের দেখিয়েছিলো তখন তাদের চক্ষুস্থির, তারা ভাবতেও পারেননি কোনোদিন এমন হতে পারে।

দেশের নেতৃত্বের আসনে বসে এরা জনগণেরই সর্বনাশ টেনে আনছেন। এরা সমাজকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। কারও কারও মুখে দাড়ি, ললাটে এবাদতের চিহ্ন, কণ্ঠে জনদরদী ভাষণ, অথচ এরা এক একজন চোরাকারবার করে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক।

সেদিন তার অফিসে বসে ভাবছিলো নূর, তরুণ ডাকুটি কৌশলে হাঙ্গেরী কারাগার থেকে পালিয়েছে।

ওকে আটক করতে বহু কষ্ট করতে হয়েছিলো, অনেক প্রচেষ্টা চালিয়ে তবে পাকড়াও করেছিলো নূর তাকে। অথচ হাঙ্গেরী কারাগার থেকে সে বিনা দ্বিধায় পালিয়ে গেলো। নূর নিজেও পুলিশবাহিনীর সঙ্গে অনেক অনুসন্ধান চালিয়েছে তবু ওকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। নূর ভাবছে অনেক কথা। ঠিক সেই মুহূর্তে মিঃ হারুন ও মিঃ শংকর রাও গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হলেন।

নূরের অফিস রুমে প্রবেশ করে নূরকে অন্যমনস্ক দেখে একটু কেশে বললেন– মিঃ নূর, কি ভাবছেন?

চমকে উঠে দাঁড়ালো নূর–কিছু না। আসুন।

মিঃ হারুন, মিঃ শংকর রাও আসন গ্রহণ করলেন।

নুরও তার নিজ আসনে উপবেশন করলো।

বললেন মিঃ হারুন– ওকে খুঁজে বের করতেই হবে মিঃ নূর।

নিশ্চয়ই সে পুনরায় সেই স্থানে গমন করেছে। একদল পুলিশবাহিনীকে আমরা সেখানে পাঠিয়েছি।

নূর বললো–আমি জানি সে ঐ স্থানে যাবে না। ওখানে পুলিশ পাঠানোর কোনো প্রয়োজন ছিলো না।

আপনি কি করে অনুমান করলেন সে ঐ স্থানে যাবে না?

অনুমান যা করেছি তা সত্য। সে জানে, ওখানে গেলে সে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না, কারণ আমরা তাকে পুনরায় গ্রেপ্তারের জন্য সেখানে হামলা চালাতে পারি।

বললেন মিঃ শংকর রাও– একথা মিথ্যা নয়। তরুণ জংলী ডাকু তার নতুন কোনো আস্তানায় যাবে এবং সেখানে আত্মগোপন করে থাকবে।

নূর বললো–আমি ওকে খুঁজে বের করবোই। আমার চোখে ধুলো দিয়ে সে কোথাও আত্মগোপন করে থাকতে পারবে না।

মিঃ শংকর রাও বললেন–কথা দিলাম মিঃ নূর, আপনাকে আমরা এ ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করবে।

একটু হেসে বললো নূর– আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমি আমার সাধনায় জয়ী হবো না জানি। কাজেই আপনাদের সাহায্য-সহযোগিতা আমাকে কর্মপ্রেরণায় উৎসাহিত করবে।

কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা চলার পর মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও বিদায় গ্রহণ করলেন।

তারা চলে গেলে নূর তার সহকারী রণজিৎকে টেলিফোন করলো। রণজিৎ নূরের ক্লাশফ্রেন্ড। তাকে সে সহকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে। নূর ওকে ভালবাসে এবং বিশ্বাস করে। অল্পদিন হলো সে বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে।

ফোনে কিছু আলাপ হলো।

তারপর বেরিয়ে এলো নূর কক্ষের বাইরে।

ক্ষুদে পিস্তলখানা ছিলো তার হাতে।

সতর্কভাবে এদিক ওদিক তাকালো কিন্তু কাউকে নূর ঐ মুহূর্তে দেখতে পেলো না।

শুধু একটা ছায়ামূর্তি যেন সরে গেলো দেয়ালের অন্তরালে। কে সে যে অতি সন্তর্পণে তাকে লক্ষ্য করে চলেছে। নিশ্চয়ই সে তরুণ নয় যে, হাঙ্গেরী কারাগার থেকে পালাতে সমর্থ হয়েছে। কারণ পথে এবং শহরের সর্বস্থানে কড়া পাহারা রয়েছে তাকে গ্রেপ্তারের জন্য।

নূর সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগুলো।

দোতলার সিঁড়ির ঘর এবং বেলকুনি ভালভাবে খুঁজে দেখলো কেউ কোথাও নেই।

ফিরে এলো নূর কক্ষে।

পিস্তলখানা টেবিলে রেখে যেমনি সে চেয়ারে বসতে যাবে অমনি পেছন জানালার শার্শীর। কাঁচ ঝন ঝন শব্দে ভেঙে পড়লো। ফিরে তাকাবার পূর্বেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই তরুণ।

নূরও প্রস্তুত ছিলো এমন একটা অবস্থার জন্য। সেও আক্রমণ প্রতিহত করবার চেষ্টা করলো এবং পাল্টা আক্রমণ চালালো। নূর ভীষণ অবাক হলো কারণ পথে এত পাহারার মধ্যেও সেই জংলী তরুণ তার বাংলোয় প্রবেশ করলো কি করে।

শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ।

নূর আর জাভেদ।

যেন দুই বাঘে লড়াই বেঁধেছে।

চলেছে ভীষণ ধস্তাধস্তি।

চেয়ার-টেবিল তুলে চললো মারামারি।

নূর পিস্তলটা হাতে নেবার চেষ্টা করছে আর জাভেদ পিস্তলটাকে যেন নূর নিতে না পারে সেই চেষ্টা করছে।

ঐ মুহূর্তে কক্ষের অবস্থা অবর্ণনীয়। সব ভেঙে তচনচ হলো। কেটে গেলো উভয়ের দেহের স্থানে স্থানে।

কেউ কম নয়, শক্তিতে দুজনই সমান।

কেউ কাউকে কাবু করতে সক্ষম হচ্ছে না।

লড়াই যখন ভীষণভাবে চলছে তখন সিঁড়িতে শোনা গেলো পদশব্দ–ভারী বুটের আওয়াজ।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড, দরজায় এসে দাঁড়ালো এক আলখেল্লাধারী– তার হাতে মারাত্মক এক অস্ত্র।

জাভেদ এবং নূরের লড়াই বন্ধ হয়ে গেলো।

নূর লক্ষ্য করলো আলখেল্লাধারী পুরুষ নয় নারী, দেহাকৃতি পুরুষের মত নয়। যদিও আলখেল্লায় রদেহ আবৃত ছিলো তবু বেশ বোঝা যাচ্ছে।

নূর লক্ষ্য করছিলো সেই অদ্ভুত পোশাকে আবৃত আলখেল্লাধারীর আপাদমস্তক। ওর হাতের অস্ত্রটা মারাত্মক যা নূর পূর্বে দেখেনি কখনও।

জাভেদ ক্ষণিকের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেও নিজকে সে সামলে নিলো, পরমুহূর্তে সে বেরিয়ে গেলো যে পথে কক্ষে প্রবেশ করেছিলো সেই পথে।

নূর ফিরে তাকালো।

কিন্তু জাভেদকে সে দেখতে পেলো না!

এদিকে দরজা থেকে অদৃশ্য হয়েছে সেই আলখেল্লাধারী।

নূর বাইরে বেরিয়ে এলো।

শুনতে পেলো সে অশ্বপদশব্দ, একটি নয় দুটি অশ্ব একসঙ্গে ছুটে চলে যাচ্ছে।

নূর অধর দংশন করে আপন মনে বললো– আমি তোমাকে ছাড়বো না, দেখে নেবো তুমি কেমন করে আমার চোখে ধূলো দাও।

নুর রিসিভার তুলে নিয়ে টেলিফোন করলো পুলিশ অফিসে। কোনো অশ্বারোহী যেন কান্দাই শহর থেকে বেরিয়ে না যেতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে ওয়্যারলেসে সংবাদটা জানিয়ে দেওয়া হলো। শহরে যে সব প্রহরী পাহারারত ছিলো তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হলো এ ব্যাপারে।

নূর নিজেও গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো, নিশ্চুপ থাকার ছেলে নয় সে। দুঃসাহসী নূর অনুসরণ করলো অশ্ব পদশব্দ।

*

আমাকে এভাবে আটকে রেখে কি লাভ হবে রাণীজী? কথাটা বলে বনহুর তাকালো রাণীর দিকে।

দস্যুরাণী মুখের আবরণ না খুলেই আজও সে বনহুরের পাশে এসেছে। সে চায় না তার মুখমন্ডল কেউ প্রকাশ্যভাবে দেখুক। রাণীজীকে আজও তার অনুচরগণ স্বচক্ষে দেখেনি। সবাই জানে তাদের রাণীজী এক বিস্ময়কর নারী। মাঝে মাঝে অনুচরদের মধ্যে রাণীজীকে নিয়ে আলাপ আলোচনা যে না চলে তা নয় কিন্তু রাণীজীকে তারা কোনোদিন দেখার সৌভাগ্য লাভ করেনি, শুধু দেখে আলখেল্লায় ঢাকা একটি দেহ–আর একটি সুন্দর মিষ্ট অথচ বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শোনে তারা।

রাণী একটু হেসে বললো–লাভ–লোকসানের হিসেব আমি জানি না তবে জানি তুমি আমার উপকার করতে পারবে এবং সেই কারণে আমি তোমাকে আটক রেখেছি।

ও, তাহলে একটা উদ্দেশ্য আছে?

আছে এবং তা তুমিই পারবে। তবে তোমাকে আমি মিছামিছি হয়রানি করবো না..একটু থেমে বললো রাণী–বিনিময়ে তুমি যা চাইবে তাই পাবে।

রাণীজীর কথায় আমি সন্তুষ্ট। জানি তুমি আমাকে বিমুখ করবে না, তোমার ওয়াদা তুমি পালন করবে।

হ, আমি কথা দিলাম।

কিন্তু কাজটা কি জানতে পারি?

বলবো কিন্তু আজ নয়।

যত শীঘ্র পায়রা আমার দ্বারা কাজ সমাধা করে নাও রাণী, এতে আমি রাজি। বললো বনহুর!

দস্যুরাণী পায়চারী করছিলো।

আবছা অন্ধকারে তার দেহের জমকালো পোশাকটা চক্ করছিলো। গুহার কঠিন মেঝেতে ভারী বুটের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো।

বনহুর তার শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় তাকিয়ে ছিলো রাণীর দিকে।

রাণী বলল, বনহুর, আমি একটা হীরকখন্ডের সন্ধান পেয়েছি যার মূল্য তোমার গলায় ঐ পাথরটার চেয়ে কম নয়। এ পাথরটা রয়েছে নীল নদের তলদেশে। যেখানে তুমি ছাড়া আর দ্বিতীয় জন নেই যে পৌঁছাতে পারে।

বনহুর ভ্রূকুঞ্চিত করে বললো–নীল নদের তলদেশে হীরকখন্ড।

হাঁ।

এ সংবাদ তুমি পেলে কি করে?

খিল খিল করে হেসে উঠলো দস্যুরাণী–এ প্রশ্ন তুমি আমাকে করবে ভাবতেও পারিনি বনহুর।

কারণ?

তুমি জানো তোমার অনুচরগণ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, তেমনি আমারও অনুচরগণ ছড়িয়ে আছে সারাটা দুনিয়ার সর্বস্থানে। আমি আশ্চর্য হচ্ছি তুমি আজও নীলনদের তলদেশের এ হীরকখণ্ডের সন্ধান জানো না বলে!

অবশ্য এ কথা সত্য। জানলে এতদিনে ওটা আমার হাতের মুঠায় চলে আসতো।

বনহুর!

বলো রাণীজী!

আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করবে।

রাজি। হাত বাড়ালো বনহুর রাণীর দিকে।

রাণী বনহুরের হাতে হাত রাখলো।

[পরবর্তী বই বনহুর ও দস্যুরাণী]

পূর্ববর্তী:

« ৭.০৮ মঙ্গল গ্রহে

পরবর্তী:

৭.১০ দস্যু বনহুর ও দস্যুরাণী »